মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
জুলাই ১৯৯৮

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

مجلة التحريك الشهرية ، مجلة علمية دينية
جلد: ١ عدد: ١١، ربيع الأول ١٤١٩هـ
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها " حديث فاؤنديشن بنغلاديش"

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ ইসলামিক সেন্টার বাঁকাল, সাতক্ষীরা-এর জামে মসজিদ।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২

* বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাঃ ১১০/০০
* ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদাঃ ৬০/০০

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০ টাকা
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০ টাকা
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০ টাকা
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০ টাকা
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০ টাকা
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০ টাকা

কারিগরী তথ্যঃ
* সাইজঃ ৯ ইঞ্চি - ৭ ইঞ্চি
* ভাষাঃ বাংলা
* মুদ্রণঃ কম্পিউটার কম্পোজ
* পৃষ্ঠাঃ ৫৬
* প্রচ্ছদঃ এক রঙা অফসেট

০ স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

Monthly AT-TAHREEK
Edited by: Dr.Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla. Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription Tk: 110/00 Only.
Address: Editor. *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA. RAJSHAHI.
Ph. (0721) 760525. Ph & Fax (0721) 761378.

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ১১তম সংখ্যা

রবীউল আউয়াল ১৪১৯ হিঃ

আষাঢ় ১৪০৫ বাং

জুলাই ১৯৯৮ ইং

সম্পাদক

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নির্বাহী সম্পাদক

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার

শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার

ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া মাদরাসা

পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং

দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৫
- প্রবন্ধ ঃ
  - হারানো স্মৃতি ৮
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ছাদেকপুর পাঠনা ১৩
    -আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১৭
    -আব্দুস সামাদ সালাফী
  - বিদ'আত ও তার পরিণতি ১৯
    -আখতারুল আমাম
  - মাক্বামা সাহিত্যে আল-হামাদানীর অবদান ২৪
    -মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক
  - যমুনা বহুমুখী সেতুঃ দীর্ঘ স্বপ্নের বাস্তবায়ন ২৮
    -মুহাম্মাদ আবু আহসান
- ছাহাবা চরিত
  - সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) ৩০
    -মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান
- গল্প
  - কাঁচির ফাঁদে মৃত্যু ৩৪
    - মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
- হাদীছের গল্প ৩৬
  -মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
- কবিতা ৩৭-৩৯
- মহিলাদের পাতা ৪০
- সোনামণিদের পাতা ৪৩
- স্বদেশ-বিদেশ ৪৫
- মুসলিম জাহান ৪৮
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৫০
- সংগঠন সংবাদ ৫১
- প্রশ্নোত্তর ৫৩

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

দিবস পালন নয়, চাই আদর্শের অনুসরণ

ঈদে মীলাদুন্নবী নামক প্রচলিত নবী দিবস সমাগত। এই দিবসকে বরণ করে নেবার জন্য সারা দেশে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। অতি গরীব মানুষটিও এদিনটি উদযাপনের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। অধিকাংশ জনগণের অনুভূতির দিকে খেয়াল করে ইসলামী বা ধর্মনিরপেক্ষ সকল দলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা এদিন ও মাসকে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদযাপন করেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কোন কোন মাদরাসা 'জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী' বের করে শহর-বন্দরের রাস্তাসমূহ প্রদক্ষিণ করে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় মিছিল নিয়ে গগণবিদারী শ্লোগানে রাস্তা মুখরিত করে তোলে। সরকারী ভাবে অধিক আড়ম্বরের সাথে এদিবস পালিত হয়। বিলাসী সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়াসী আয়োজন করা হয়। বড় বড় বুলি আওড়ানো ছাড়া যার ফলাফল হয় শূন্য। শহরের বিলাসবহুল হোটেলগুলো দেশী-বিদেশী আমন্ত্রিত মেহমানদের আপ্যায়নে সরগরম হয়ে উঠে। কোটি কোটি টাকা এদিবসকে সামনে রেখে খরচ করা হয়। কিন্তু একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি, যে নবীর মহব্বতে এসব করছি, তিনি এতে খুশী না হ'য়ে বরং নাখোশ হবেন। ক্বিয়ামতের দিন হাউয কওছারের পানি পান করার জন্য যখন আমরা সকলে তাঁর নিকটে ভিড় জমাবো, তখন ফেরেশতাগণ আমাদেরকে সরিয়ে দিবেন ও রাসূল (ছাঃ) আমাদের মত বিদ'আতীদেরকে 'সুহক্বান' 'সুহক্বান' 'দূর হও' 'দূর হও' বলে তাড়িয়ে দিবেন।

আমরা কি তাহ'লে ছাহাবীদের চাইতে বেশী রসূলপ্রেমী হয়ে গেলাম? রাসূলের ২৩ বছরের নবুঅতী জীবন ও তাঁর পরে আবুবকর, ওমর, উছমান ও আলী (রাঃ)-এর দীর্ঘ ৩০ বছরের খেলাফতকাল এমনকি তার পরেও ৬০৫ বা ৬২৫ হিজরী পর্যন্ত কোন মুসলমান তো মীলাদ অনুষ্ঠানের নামও জানতেন না। রাসূলের প্রেমে গদগদ হ'য়ে কই তারা তো কোন রাষ্ট্রীয় বা সাধারণ অনুষ্ঠানও করেননি। রাস্তায় মিছিল করেননি। মিষ্টি বিলাননি। মীলাদুন্নবী, ইয়াওমুন্নবী, দাওয়াতুন্নবী বা সীরাতুন্নবী পালন করেননি। যেখানে জুম'আর দিনকে ছিয়াম ও রাতকে ইবাদতের জন্য খাছ করে নিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করলেন। যেখানে নিজের জন্ম ও মৃত্যু দিবস **সোমবার**। নবুঅত প্রাপ্তির দিন সোমবার। ছওর গিরিগুহা থেকে মদীনায় হিজরত দিন **সোমবার**। মদীনার উপকণ্ঠে ক্বোবায় উপনীত হওয়ার দিন **সোমবার**। মৃত্যুর অসুখ শুরুর দিন **সোমবার** হওয়া সত্ত্বেও এই বিশেষ দিনে উম্মতকে দিবস পালনের ইঙ্গিত দিলেন না বা নিজেও কোন অনুষ্ঠান করলেন না; সেখানে আমরা কার অনুসরণে এসব করছি? আমরা কি তবে মীলাদের আবিষ্কারক ইরাকের এরবল এলাকার শাসক আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরীর (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) অনুসরণ করছি? না খৃষ্টানদের পালিত যীশু খৃষ্টের কাল্পনিক জন্মদিন X-mas day বা বড় দিনের অনুসরণে আমাদের নবীর বড় দিন উদযাপন করছি? তাও আবার তাঁর মৃত্যু দিবসে জন্মদিন পালন!

যখন কসোভো, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা মুসলমানের রক্তে ভাসছে। ইয্যতহারা মা-বোনদের আহাযারীতে আকাশ-বাতাস ভারি হচ্ছে। বাংলাদেশের সর্বত্র চলছে খুন-ধর্ষণ ও রাহাযানির ক্বিয়ামত সদৃশ মর্মন্তুদ জীবন যন্ত্রণা। যখন ইসলামের আইন ও বিধান জারির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা প্রতিটি সুনাগরিকের আন্তরিক কামনা। তখন রাসূল (ছাঃ)-এ রেখে যাওয়া অহি-র বিধানকে পাশ কাটিয়ে তাঁর নামে মিথ্যা প্রশংসার অনুষ্ঠান করে সেযুগের কুকুবুরীর মত এ যুগের মিথ্যা নবীপ্রেমিকগণ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন অবলীলাক্রমে বাধ-হীন গতিতে। অতএব দেশের দায়িত্বশীল সরকার ও সচেতন দ্বীনদার ভাইদের প্রতি **আমাদের আবেদনঃ** শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহের পিছনে অহেতুক অপচয় বন্ধ করে সেগুলি তাওহীদ ও সুন্নাহ্র পথে ও নির্ভেজাল দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতে ব্যয় করুন! শিরকের পক্ষে বিদ'আতের পক্ষে যখন সরকারী ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, তখন তাওহীদ ও সুন্নাহ্র দাবীদারগণ নিশ্চুপ কেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথে দীপ্যমান ভাই-বোনেরা কোথায়? কাল ক্বিয়ামতের মাঠে যখন বিদ'আতীরা আপনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করবে আপনাদের অলসতার বিরুদ্ধে, আপনাদের কৃপণতার বিরুদ্ধে, আপনাদের দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে, তখন আপনি কি জওয়াব দিবেন? বন্ধুকে বাদাম না খাইয়ে সেই পয়সা দিয়ে একটা ছোট্ট পুস্তিকা কিনে তাকে পড়তে দিন। যদি বন্ধু এর দ্বারা বিদ'আত হ'তে তওবা করেন, তবে তিনি ও তার পরবর্তী প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ বিদ'আত হ'তে মুক্ত থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। ফলে তার ও তাদের আমলনামায় যত নেকী সঞ্চিত হবে, তার সমপরিমাণ নেকী আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আপনার আমলনামায় জমা হবে বলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওয়াদা করেছেন। নেকী উপার্জনের এই সুন্দর সুযোগটি আপনি হাত ছাড়া করতে চান? একবার মনের চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখুন তো আপনার মৃত্যুকাতর পিতার পাংশু চেহারার দিকে। আপনাকে বড় করার জন্য, সুন্দর করার জন্য, সুখী করার জন্য যিনি তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। একবার তাকিয়ে দেখুনতো আপনার কাফনে ঢাকা মায়ের বিবর্ণ চেহারার দিকে। দেহের শোষিত রক্তের সবটুকু দিয়ে বুকের সঞ্চিত সুধা উজাড় করে দিয়ে শীত-গ্রীষ্মের ও রাত্রি-দিনের সকল আরামকে হারাম করে যিনি আপনাকে মানুষ করেছেন তিলে তিলে। আজ তাঁরা কবরে শুয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আপনার দো'আর, আপনার ছাদকার, আপনার উপহারের। কেন তাঁকে কিছু দিচ্ছেন না? কেন তাদেরকে ভুলে যাচ্ছেন? আপনি আপনার পিতাকে ভুললে আপনার সন্তানেরা আপনাকে ভুলবে- একথা ধরে নেওয়া যায়। অতএব আসুন! যার যা আছে তাই নিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মাল নিয়ে, জান নিয়ে, যবান ও কলম নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মুজাহিদের সম্মান ও মর্যাদা বসে থাকা অলসদের চাইতে বেশী। আসুন সেই মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

উত্তম নমুনা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُواالله وَالْيَوْمَ الاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا-

১. উচ্চারণঃ লাক্বাদ কা-না লাকুম ফী রাসূলিল্লা-হি উসওয়াতুন হাসানাতুল লিমান কা-না ইয়ারজুল্লা-হা ওয়াল ইয়াওমাল আ-খিরা, ওয়া যাকারাল্লা-হা কাছীরা।-আহযাব ২১।

২.অনুবাদঃ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের কামনা রাখে ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে'।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ (১) লাক্বাদ কা-না লাকুম-'নিশ্চয়ই রয়েছে তোমাদের জন্য' (২) ফী রাসূলিল্লা-হি- 'রাসূলুল্লাহর মধ্যে'। এর দ্বারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে (৩) উসওয়াতুন হাসানাতুন 'উত্তম নমুনা' (৪) লিমান কা-না ইয়ারজুল্লা-হা 'যে ব্যক্তি কামনা করে আল্লাহকে' অর্থাৎ আল্লাহর দীদার ও রহমতকে (৫) ওয়াল ইয়াওমাল আ-খিরা 'এবং শেষ দিবসকে' অর্থাৎ বিচার দিবসে মুক্তি কামনা করে (৬) ওয়া যাকারাল্লা-হা কাছীরা 'এবং আল্লাহকে স্মরণ করে অধিকহারে'।

৪. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ এই আয়াতটি ৫ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের বিভীষিকাময় অবস্থায় নাযিল হয়। যখন নবী ও ছাহাবীগণ চুক্তিভঙ্গকারী ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা, স্থানীয় বেদুঈন লুটেরা ও কুরায়েশ মুশরিকদের ত্রিমুখী শত্রু বাহিনীর মাসব্যাপী সম্মিলিত অবরোধের মধ্যে কঠিন বিপদের মুকাবিলায় এক প্রকার দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন ও রাসূল (ছাঃ) কঠিন ধৈর্যের সাথে আল্লাহর রহমতের প্রতীক্ষায় থেকে পরিস্থিতি মুকাবিলা করছিলেন। সেই সময় রাসূলের গভীর আল্লাহ প্রেম, তাঁর উপরে অটুট ভরসা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আদর্শ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দিয়ে অত্র আয়াত নাযিল হয়। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقواله و أفعاله و أحواله

'এই পবিত্র আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অবস্থাদি অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট মূলনীতি'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হিসাবে। জান্তব ও পাশব শক্তির বিরুদ্ধে ছিল তাঁর উত্থান। আল্লাহর 'অহি' ছিল তাঁর একমাত্র পথ নির্দেশক। অহি-র জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত পথে তিনি চলতেন দৃঢ় পদে। সংখ্যা শক্তির তোয়াক্কা তিনি কখনোই করেননি। বিপদে-সম্পদে, দুঃখে-আনন্দে, স্বগৃহে ও নির্বাসনে, মসজিদে ও ময়দানে, রাষ্ট্র শাসনে ও পরিবার পালনে সর্বত্র-সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মানবজাতির আদর্শ ও সর্বোত্তম নমুনা। মানব চরিত্রে সম্ভাব্য সকল প্রকারের মহৎ গুণ তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ। 'আমি প্রেরিত হয়েছি সুন্দরতম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য'।[২] তাই মানুষ হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট, নবীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

একদা মা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তাঁর চরিত্র ছিল পূর্ণাংগ কুরআন'।[৩] অর্থাৎ তিনি ছিলেন কুরআন বর্ণিত জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা। কুরআন যেমন ত্রুটিশূন্য, তাঁর জীবন ছিল তেমনি ত্রুটি শূন্য। কুরআন যে সমাজব্যবস্থা পৃথিবীতে কায়েম করতে চায়, তাঁর জীবন ছিল তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর প্রতিটি কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণ তাই কুরআনী সমাজের প্রতিষ্ঠাকামী প্রত্যেক মুমিনের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ স্বীয় নবী চরিত্রের সত্যায়ন করে বলেন, وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত' (কলম ৪)।

মানুষের জীবনের রূহানী জগত ও বৈষয়িক জগতের জন্য মানুষ সাধারণতঃ দু'ধরণের আদর্শ তালাশ করে থাকে। কিন্তু মূলতঃ একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন হ'লেও বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন হাত, পা ও মাথা পরস্পরে ভিন্ন হ'লেও মানবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের একই চিন্তাধারা অনুযায়ী হাত-পা কাজ করে থাকে। হাত ও পায়ের কর্মক্ষেত্র ও বিচরণক্ষেত্র পৃথক হ'লেও তাদের উভয়ের কাজের লক্ষ্য থাকে একই। সেকারণ চিন্তাজগতের পরিশুদ্ধি কর্মজগতে পরিশুদ্ধি আনয়ন করে।

মুসলমানের সকল ধর্মীয় ও বৈষয়িক কর্মের শেষ লক্ষ্য হয় আত্মার পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নফ্স এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। খালেছ নিয়ত ও পরিশুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা অসম্ভব। ছালাত একটি নিছক ধর্মীয় কাজ। কিন্তু এই ছালাত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সমর্থ হবে না, যদি সেখানে 'রিয়া' বা লোক দেখানোর গোপন ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকে।

১. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ২য় সংস্করণ ১৯৮৮) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৩।

২. মুওয়াত্ত্বা, আহমাদ, মিশকাত হা/৫০১৬।

৩. ইবনুজারীর, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাঊদ, তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরায়ে 'কলম' ৪ আয়াত; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪২৯ ও ৪৬৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

অমনিভাবে 'যাকাত' একটি নিছক অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক কাজ। অথচ সেটাও পরকালীন মুক্তির অসীলা হবেনা, যদি সেখানে অনুরূপ ইচ্ছা থাকে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্ণ আকাংখা না থাকে।

অতএব ছালাতের ন্যায় রূহানী ইবাদত ও যাকাতের ন্যায় বৈষয়িক ইবাদত-এর লক্ষ্য হচ্ছে তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল করা। রিয়া ও অহমিকা মুক্ত খালেছ নিয়ত ব্যতীত রূহানী হৌক বা বৈষয়িক হৌক কোন কর্মেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে বহু ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা বা সমাজনেতা অতীত হয়ে গেছেন। কিন্তু বিশ্বনেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে এমন কোন্ গুণ ছিল, যে কারণে তিনি বিশ্বের নমুনা হিসাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হ'লেন? কি গুণের কারণে তিনি মুসলিম-অমুসলিম গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হ'লেন?

আমাদের দৃষ্টিতে মৌলিক সে গুণটি ছিল এই যে, তিনি স্বীয় রূহানী জগত ও বৈষয়িক জগতকে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি পূর্ণাংগ আদর্শ হ'তে পেরেছিলেন। বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হৃদয় ও কর্মজগতকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে যথার্থভাবে সক্ষম হয়েছিলেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনধারার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন। আর একারণেই তাঁর জীবনাদর্শ সর্বকালের সর্বজনের নিকটে বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছে।

নবুঅতের পূর্বে হেরা গুহার নিভৃত কোণে দুনিয়াত্যাগী ধ্যান মৌন সাধক, নবুঅত লাভের পরে রাত্রির শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের ছালাত রত আল্লাহ প্রেমিক নিবেদিত প্রাণ মুছল্লী, বদর বিজেতা অকুতোভয় সেনাপতি, হোদায়বিয়া সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের দূরদর্শী রাজনীতিক, বিদায় হজ্জ-এর কালজয়ী বাগ্মী, খাদীজা-আয়েশার প্রেমময় স্বামী, ফাতেমার স্নেহময় পিতা, হাসান-হোসায়েনের খেলার সাথী নানা, বিধবা, ইয়াতীম ও সর্বহারাদের বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল, মিথ্যা ও খেয়ানত মুক্ত 'আল-আমীন', আল্লাহপ্রেরিত অহি-র বিধানের আপোষহীন অনুসারী, বাপ-দাদার ধর্মবিশ্বাস ও কঠোর সামাজিক চাপ উপেক্ষা করে সত্যসেবী সর্বস্বহারা মুহাজির, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং তায়েফ, বদর, খন্দক, হোনায়েন-এর কঠিনতম পরীক্ষায় দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল ধৈর্যশীল, কাফির-মুনাফিকদের নিরন্তর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে আল্লাহ্র উপরে একান্ত ভরসা করার অনুপম দৃষ্টান্ত যদি বিশ্ব একজন ব্যক্তির জীবনে একত্রে দেখতে চায়, তবে সেটা পাওয়া যাবে ইবরাহীমী দো'আর বাস্তবফল, আব্দুল্লাহও আমেনার ইয়াতীম দুলাল মরুভাস্কর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে।

আবু জাহ্ল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানুষ সেটাকেই তাদের ভাগ্যলিপি হিসাবে ধরে নিয়েছিল। এর বাইরে যে কিছু বাস্তবতা থাকতে পারে, সে চিন্তা তাদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছিল। নবুঅত-পূর্ব জীবনে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ কখনোই এগুলির সাথে আপোষ করেননি। কখনো মূর্তিপূজা করেননি, কখনোই মূর্তির নামে উৎসর্গীত পশুর গোস্ত খাননি, মদ স্পর্শ করেননি। এক কথায় কোনরূপ অন্যায়-অপকর্মের ধারে-কাছে তিনি যাননি। বরং এসবের প্রতিরোধের জন্য তিনি ১৬ বছর বয়সে বনু হাশিম, বনু আবদিল মুত্ত্বালিব, আসাদ বিন আব্দুল ওয্যা, যোহরা বিন কিলাব, তাইম বিন মুররাহ প্রভৃতি গোত্রের চরিত্রবান যুবকদের ডেকে নিয়ে 'হিল্ফুল ফুযূল' নামে 'যুব সংগঠন' কায়েম করেন এবং সকলে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, তারা সর্বশক্তি দিয়ে মযলূমের পাশে দাঁড়াবেন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবেন'।[৪]

আর এটাই ছিল বিশ্বের সর্ব প্রথম কল্যাণমূখী যুবসংঘ ও সমাজমুখী সেবাসংঘ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর কর্মধারাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংস্কার কর্মসূচীকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। ঈমান, ইবাদত ও মু'আমালাত। প্রথম কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রথম মানুষের চিন্তাজগতে জেঁকে বসা নানামুখী শিরক ও বিদ'আতী ধ্যান-ধারণা উৎসাদন করে এক আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাসকে নিরংকুশ করার প্রতি জনগণকে আহবান জানান। ২য় কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি আল্লাহ্র প্রতি বান্দার আত্মনিবেদন তথা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত সমূহের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। ৩য় কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি মানুষের বৈষয়িক ও সামাজিক আচরণ বিধি ব্যাখ্যা করেন, যা ইসলামী শরীয়তের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে কুরআন ও হাদীছের পাতায় পাতায় লিখিত এবং নবী ও ছাহাবীদের বাস্তব জীবনধারায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি সকল যুগের সেরা সংস্কারক ও সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণিত হয়েছেন এবং সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে সকলের নিকটে বরিত ও সমাদৃত হয়েছেন।

সংস্কারক হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)ঃ

সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা, অন্যায় বিমুখতা, আর্ত মানবতার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি, শান্তিপ্রিয়তা, সহজ-সরল জীবনধারা, বিনয়-নম্র মহান চরিত্র, ধৈর্য, ক্ষমা ও বিরল উদারতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর সাথে সাথে সমাজ সংস্কারক হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে অনন্য অবদান রেখেছিলেন, তার তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিপর্যস্ত যুদ্ধ জর্জরিত আরব জাতিকে একক 'ঈমান'-এর বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় জাতিতে

৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী আর- রাহীকাল মাখতূম। পৃঃ ৫৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিণত করতে সক্ষম হন। আর ঈমানী অস্ত্রের সফল প্রয়োগে যুগ যুগ ধরে জমে থাকা পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষির আগুন নিভে যায় ও মানবতা বিকাশ লাভে সমর্থ হয়। P.K. Hitti যথার্থই বলেন, Thus by one stroke the most vital bond of Arab relationship, That the tribul kinship, was replaced by new bond, that of faith.

অর্থাৎ 'আরব জাতির একমাত্র বন্ধন- গোত্রীয় প্রীতি, একটি মাত্র আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং ঈমান সেই স্থান দখল করে নিল'। ঐতিহাসিক Bosworth বলেন, 'যদি কেউ ঐশ্বরিক বিধান সম্মত শাসন প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবী করেন, তবে তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত আর কেউ নহেন'। খোদাবখ্শ বলেন, 'গোত্র ভিত্তিক সমাজের বিনাশ ও তদস্থলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপনই ছিল মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষার তাৎক্ষণিক ফল (Immediate result)। ঐতিহাসিক ফিলিপ, কে, হিট্টি বলেন, Out of the religious community of al-Madinah the later and larger state of Islam were.

অর্থাৎ 'মদীনার ধর্মভিত্তিক সমাজ হ'তে পরবর্তীকালে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে'। ঐতিহাসিক রায়মণ্ড লার্জ বলেন, The founder of Islam is, infact, The promoter of the first social and international revolution of which history gives mention.

অর্থাৎ 'প্রকৃত পক্ষে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূচনাকারী হিসাবে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম ইতিহাসে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে'। Ency. of Britanica -তে বলা হয়েছে Of all the religious personalities of the world Muhammad was the most succesful. অর্থাৎ 'বিশ্বের সকল ধর্ম প্রচারকের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা সফল'।

জীবনে চলার পথে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের শত গীবত-তোহ্মত ও বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্বজন নন্দিত ও সর্বপ্রশংসিত। যে প্রশংসিত বা মুহাম্মাদ ও আহমাদ নামে তাঁর দাদা ও মাতা ছোট বেলায় বড় আশা করে তাঁর নাম রেখেছিলেন, তাঁদের সে আশা সার্থক হয়েছিল। হাস্সান বিন ছাবিত তাই নবীর (ছাঃ) প্রশংসায় কবিতা লিখে বলেন, وشق له من إسمه ليجلّه +

فذو العرش محمود و هذا محمد 'তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ নিজের নাম থেকে রাসূলের নামের উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তাই আরশের মালিক হ'লেন **মাহমূদ** ও ইনি হ'লেন **মুহাম্মাদ**'। প্রশংসিত সেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের নবী, হাদী ও পথপ্রদর্শক। তাঁর দেখানো পথেই আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। সকল সুন্দর ও কল্যাণের বিষয়ে তিনি আমাদের একমাত্র নমুনা। জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে কেবল তাঁরই অনুসরণ করতে পারলেই আমাদের মুক্তি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

দরসে হাদীছ

শামায়েলে মুহাম্মাদী বা মুহাম্মাদী চরিত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

رواه أحمد و مالك فى المؤطا-

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন' বু'ইছ্তু লি উতাম্মিমা হুস্নাল আখালা-ক্বি' অর্থাৎ আমি প্রেরিত হয়েছি সুন্দর চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য'।[১]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে পূর্ণ চরিত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান ব্যাখ্যায় আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে মুহাম্মাদী চরিত্রের ছিটেফোঁটা তুলে ধরার চেষ্টা পাব। যেমন-

(১) লজ্জাশীলঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, পর্দানশীন লজ্জাশীলা কুমারী মেয়ের চাইতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক লজ্জাশীল ছিলেন'।[২] কোন কিছু খারাব মনে করলে তাঁর চেহারাই তা বলে দিত। মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। কারু কোন কাজ অপসন্দ হ'লে তার নাম ধরে না বলে সাধারণভাবে বলতেন (আবুদাঊদ)। দৈনন্দিন জীবনেও তিনি নিজের কাজ নিজে করা পসন্দ করতেন। লজ্জায় কাউকে কিছু বলতেন না। কোন ব্যক্তি তাঁর নিকটে এসে ওযর পেশ করে ক্ষমা চাইলে তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করতেন (তিরমিযী)।

(২) স্বল্পবাকঃ তিনি অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। মিষ্ট ও স্বল্পভাষী ছিলেন। কথা এমন মার্জিত ও আন্তরিক ছিল যে, শ্রোতার হৃদয় জয় করে নিত। এজন্য জাহিল শত্রুরা তাঁকে 'জাদুকর' বলত। কথা ধীরে ও স্পষ্টভাবে বলতেন। শ্রোতা ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারত।[৩] তিনি জোরে হাসি পসন্দ করতেন না। সাধারণতঃ মুচকি হাসতেন।[৪]

(৩) নম্রহৃদয়ঃ তিনি নম্র হৃদয় ছিলেন। কারু মৃত্যু সংবাদ শুনলে চক্ষু অশ্রু সজল হয়ে উঠত। তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি কখনো কখনো কেঁদে ফেলতেন। (ক) একবার ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ)-কে কুরআন শুনাতে বললেন।

১. আহমাদ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/ ৫০৯৬-৯৭।
২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৩।
৩. বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৫।
৪. বুখারী, মিশকাত হা/ ৫৮১৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

যখন তিনি সূরায়ে নিসা ৪১ নং আয়াতে পৌঁছলেন যেখানে বলা হয়েছে- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا 'সেদিন কেমন হবে, যেদিন প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা এক একজন সাক্ষী গ্রহণ করব এবং আপনাকে আমি সকল উম্মতের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাবো'। তখন তিনি বললেন, থামো'। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) মাথা উঠিয়ে দেখেন যে, রাসূলের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে' (বুখারী)। (খ) একদা মক্কায় দুর্ভিক্ষ আসে। আবু সুফিয়ান ঐ সময় রাসূলের ঘোর দুশমন ছিলেন। তিনি এসে রাসূলকে আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করার অনুরোধ জানালেন। রাসূল (ছাঃ) দো'আ করলেন। ফলে বর্ষা নেমে যমীন সিক্ত হ'ল' (বুখারী 'মুশরিকের সুপারিশ' অধ্যায়)।

(৪) **খানাপিনাঃ** তিনি কম খাওয়া পসন্দ করতেন। বলতেন পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য দ্বারা ও তিন ভাগের এক ভাগ পানি দ্বারা ভর এবং বাকী তিন ভাগের এক ভাগ খালি রাখ। তিনি রাতে না খেয়ে ঘুমাতে ও খাওয়ার সাথে সাথে ঘুমাতে নিষেধ করতেন। ফল ও তরকারি খেতে ভালবাসতেন (যাদুল মা'আদ)।

(৫) **রোগী সেবাঃ** তিনি রোগীদের দেখতে যেতেন এবং 'লা বা'সা তুহূর ইনশা-আল্লাহ' বলে সংক্ষিপ্ত দো'আ করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। রোগী কি খেতে চান, তা শুনতেন ও তা ক্ষতিকর না হ'লে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। (ক) একটি ইহুদী বালক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার বাড়ীতে গিয়ে সান্ত্বনা দেন'। অসুখে তিনি নিজে যেমন ঔষধ খেতেন, অন্যকেও তেমনি খেতে বলতেন। দক্ষ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে বলতেন এবং অদক্ষ চিকিৎসকের নিকটে যেতে নিষেধ করতেন। কিছু কিছু রোগী থেকে সুস্থদের দূরে থাকার নির্দেশ দিতেন (যাদুল মা'আদ)। তিনি বলতেন, يا عبادَ الله تداعَوْا فان الله لم يَضَعْ دَاءً إلا وضع له شفاءً غيرَ داءٍ واحدٍ هو الهرمُ رواه احمد والترمذى وابوداود باسناد صحيح – 'হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা করাও।! কেননা আল্লাহ এমন কোন রোগ রাখেননি, যার ঔষধ রাখেননি। কেবলমাত্র একটি ব্যতীত। আর সেটা হ'ল বার্ধক্য।[৫]

(৬) **হাদিয়া-তোহফাঃ** মুখলিছ ছাহাবা এমনকি ইহুদী ও নাছারাগণ তাঁকে হাদিয়া পাঠাতেন এবং তিনি তা কবুল করতেন। তাদেরকেও তিনি হাদিয়া পাঠাতেন। কিন্তু মুশরিকদের হাদিয়া কবুল করতেন না। তিনি কখনোই ছাদকা খেতেন না। এমনকি তাঁর হাশেমী বংশের জন্য ছাদকা খেতে নিষেধ করেছেন। তাঁর নিকটে মূল্যবান কোন হাদিয়া এলে তিনি অধিকাংশ সময় তা গরীব ছাহাবীদের মধ্যে বিলি করে দিতেন।

(৭) **শিশুদের প্রতি স্নেহ ও বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাঃ** তিনি যখন শিশুদের নিকট দিয়ে যেতেন, তখন নিজে থেকেই তাদেরকে সালাম করতেন। তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। আদর করে কোলে উঠাতেন। বৃদ্ধ ও বয়স্কদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। মক্কা বিজয়ের পরে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) স্বীয় দুর্বল ও অন্ধ পিতাকে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে নিয়ে এলেন ইসলামের বায়'আত করানোর জন্য। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনার কি দরকার ছিল? আমি নিজেই ওনার কাছে চলে যেতাম?

(৮) **জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ** (ক) খন্দকের যুদ্ধে গুরুতর আহত আউস গোত্রের নেতা সা'আদ বিন মু'আয (রাঃ) চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা গোত্রে শালিশী বৈঠকের শালিশ হিসাবে এলে এবং গাধার পিঠ থেকে নামতে কষ্টবোধ করলে রাসূল (ছাঃ) লোকদেরকে নির্দেশ দেন قوموا إلى سيدكم 'কূমূ এলা সাইয়েদেকুম'-তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যে এগিয়ে যাও'।[৬]

দুর্ভাগ্য পরবর্তীকালে বিদ'আতী আলেমরা এই হাদীছকে তাদের আবিষ্কৃত মীলাদে কিয়াম প্রথার পক্ষে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ রাসূলের (ছাঃ) রূহ মুবারক হাযির হয়েছে। তোমরা সকলে তাঁর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাও (নাঊযুবিল্লাহ)। জীবন্ত একজন দুর্বল মানুষকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সাথে মৃত নবীর রূহ মুবারক-এর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে তুলনা করা হয়েছে। কি বিভ্রান্তিকর ক্বিয়াস! (খ) রাসূল (ছাঃ)-এর কবি হাস্সান বিন ছাবিত আনছারী খাযরাজী (রাঃ) ইসলামী বিরোধীদের জওয়াবে কবিতা লিখতেন ও বলতেন। এই গুণী কবির সম্মানে রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে পৃথক মিম্বর স্থাপন করতেন। যার উপরে দাঁড়িয়ে তিনি কবিতা পাঠ করতেন।[৭]

(৯) **ইবাদতের ধারাঃ** তিনি নফল ইবাদত লুকিয়ে করতেন। যাতে উম্মত তার অনুসরণ করতে গিয়ে কঠিন অবস্থায় না পড়ে। (ক) একদা এক মহিলার ঘরে রশি ঝুলানো দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? লোকেরা বলল, মহিলাটি রাত্রে নফল ইবাদত করার সময় তন্দ্রা আসলে ঐ রশি ধরেন, যাতে ঘুম পালিয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) রশি খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, নফল ইবাদত

---

৫. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৩২ 'চিকিৎসা' অধ্যায়।

৬. বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হা/৩৯৬৩ 'বন্দীদের হুকুম' অধ্যায়।

৭. *বুখারী, মিশকাত হা/ ৪৮০৫ 'বক্তৃতা ও কবিতা 'অধ্যায়।*

অতক্ষণ করবে যতক্ষন হৃদয়ে উৎসাহ বোধ করবে' (বুখারী, রিক্বাক্ব' অধ্যায়)। (খ) যুবক ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-কে একবার তিনি বলেন, আমি শুনেছি তুমি নাকি সারারাত ইবাদতে রত থাকও প্রত্যেক দিন ছিয়ামে লিপ্ত থাক? একাজ করোনা বরং একদিন ছিয়ামে থাক ও একদিন খাও। ইবাদত কর ও ঘুমাও। কেননা তোমার উপরে তোমার দেহের হক রয়েছে'.... (বুখারী, 'নিকাহ' অধ্যায়)। যখন কোন ব্যাপারে দু'টি পথ সামনে আসত, তখন তিনি সহজ পথটি গ্রহণ করতেন।[৮] ওয়ায-নছীহত তিনি সর্বদা করতেন না, যাতে জনগণ বিতৃষ্ণ না হয় (বুখারী)।

(১০) **ন্যায় নিষ্ঠাঃ** কোন ক্ষেত্রে ঝগড়া হ'লে তিনি নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা করতেন। (ক) মাখযূম গোত্রের ফাতেমা নাম্নী জনৈকা মহিলা একদা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। বনু কুরায়েশ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখে ও রাসূলের প্রিয়পাত্র তরুণ ছাহাবী উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-কে সুপারিশ করার জন্য পাঠায়। রাসূল (ছাঃ) তখন দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন শরীফ লোক চুরি করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত। কিন্তু যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তাকে শাস্তি দিত। وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا– 'আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[৯] তিনি কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না। তবে আল্লাহ্র হুদূদ (শাস্তি) কায়েম করতে দ্বিধা করতেন না'।[১০]

(১১) **ধৈর্য ও সামাজিক জীবনঃ** তিনি ছবর ও ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। (ক) যায়েদ বিন সা'না নামক জনৈক ইহুদীর নিকটে তিনি ঋণগ্রস্থ ছিলেন। সে একদিন টাকা চাইতে এল। এসেই রাসূলের কাঁধের চাদর এক ঝটকায় নামিয়ে নিল ও দেহের কাপড় ধরে সজোরে টানতে লাগল এবং বংশের নাম ধরে বলল যে, আব্দুল মুত্ত্বালিবের লোকেরা বড়ই ঋণ খেলাফী হয়ে থাকে'। একথা শুনে ওমর ফারূক (রাঃ) তাকে ভীষণভাবে ধমক দিলেন। রাসূল (ছাঃ) এতে হেসে ফেলে বললেন, ওমর তোমার উচিত ছিল আমার এবং ওনার সাথে অন্যভাবে আচরণ করা এবং তাকে একথা বুঝানো যে, সুন্দরভাবে যেন তিনি আমার নিকট থেকে ঋণ আদায় করে নেন। ঠিক আছে এখনো তো মেয়াদ শেষ হ'তে তিন দিন বাকী আছে। অতএব হে ওমর! তুমি ঋণটা পরিশোধ করে দাও এবং বিশ ছা' (৫০ কেজি) বেশী দাও। কেননা তুমি তাকে ধমকিয়েছ ও ভয় দেখিয়েছ।' বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে যে, এইউত্তম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকটি মুসলমান হয়ে যায়। (খ) একবার এক বেদুঈন এসে রাসূলের গায়ের চাদর এমন জোরে টান দেয় যে, তাঁর কাঁধের উপরে ঘর্ষণের দাগ পড়ে যায় ও তিনি টানের চোটে ঐ বেদুঈনের বুকের মধ্যে এসে পড়েন। সে কর্কশ স্বরে বলল হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকটে যে আল্লাহ্র মাল আছে, তা থেকে আমাকে দাও! রাসূল তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তার চাহিদামত বায়তুল মাল থেকে খাদ্য দিলেন।[১১]

(১২) **পারিবারিক জীবনঃ** মা আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে পরিবারিক কাজ করতেন। অতঃপর ছালাতের সময় হ'লে বেরিয়ে যেতেন।[১২] নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই করতেন, দুগ্ধ দোহন করতেন। এছাড়াও নিজের কাজ নিজে করতেন।[১৩] তিনি শুয়ে ঠেস দিয়ে খেতেন না। বলতেন যে, আমি খাই এমনভাবে যেমন একজন সাধারণ গোলাম খায় এবং আমি বসি এমনভাবে যেমন একজন গোলাম বসে'।[১৪]

(১৩) **আল্লাহ্র উপরে ভরসাঃ** তিনি স্বীয় জীবনকে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সর্বদা তাঁর উপরেই ভরসা করতেন ও সর্বদা আসমানী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন। (ক) আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদের সাথে বসে কথা বলতেন, তখন অধিকাংশ সময় আসমানের দিকে তাকাতেন[১৫] (খ) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে নাজ্দের দিকে এক যুদ্ধে ছিলাম। ফেরার পথে একটি ছায়াঘেরা মরুদ্যানে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে নামলেন। আমরাও নেমে গাছের তলায় আশ্রয় নিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সামুরা গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন ও তরবারীটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ রাসূলের ডাক শুনে আমরা জেগে উঠে দেখি যে, সেখানে একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আমার ঘুম অবস্থায় আমার তরবারি নিয়ে আমাকে মারার জন্য উদ্যত হয়ে বলছে, এখন কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি তিনবার বললাম 'আল্লাহ'।[১৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একথা শুনে লোকটির হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তখন রাসূল সেটি তুলে ধরে বললেন, এখন কে তোমাকে রক্ষা করবে? সে বলল, আপনি ভাল ব্যবহারকারী হৌন! রাসূল (ছাঃ) বল্লেন, তুমি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ কর। সে বলল, না। তবে আমি ওয়াদা করছি যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে সরাসরি বা অন্যদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করব না।রাসূল (ছাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন।

৮. মিশকাত হা/৫৮১৭ আয়েশা হ'তে।
৯. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/ ২৬১০ 'হুদূদ' অধ্যায়।
১০. মিশকাত হা/ ৫৮১৭।
১১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮০৩।
১২. বুখারী, মিশকাত হা/ ৫৮১৬।
১৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮২২।
১৪. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/ ৫৮৩৬।
১৫. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/ ৫৮৩০।
১৬. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/ ৫৩০৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

লোকটি তার গোত্রে ফিরে গিয়ে বলল, আমি শ্রেষ্ঠ মানুষের নিকট থেকে ফিরে এলাম'।[১৭]

(১৪) **ব্যক্তি চরিত্রঃ** রাসূলের ব্যক্তি চরিত্র এত সুন্দর ছিল যে, নবুঅত লাভের পূর্বে জাহেলী যুগের কোন কালিমা তাঁকে স্পর্শ করেনি। দু'দুবার এমন কিছু ঘটতে গিয়েও ঘটেনি। (ক) ১০ বছরের কম বয়সে তিনি একবার সাথী মেষপালকদের সাথে মেষ চরাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তাদের একজনকে বললেন, তোমরা আমার মেষগুলি দেখো। আমি একটু গল্প শোনার আসর থেকে ঘুরে আসি। তিনি শহরে পৌঁছার পূর্বে বাড়ীতে পৌঁছেন। সেখানে এক বিয়েতে 'দফ' বাজনা হচ্ছিল। তিনি তা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেলেন। ফলে শহরে যাওয়া হ'ল না (শিফা, কাযী আয়ায)। আর একবার অনুরূপ ইচ্ছা করলেও তা পূরণ হয়নি। (খ) নবী হওয়ার পূর্বে একবার যায়েদ বিন আমর তাঁকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার সময় তিনি বলেন,

إنى لا آكلُ مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه 'তোমরা প্রতিমার নামে যেসব যবহ কর, আমি তা খাইনা এবং যার উপরে যবহের সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়নি, সে সবের গোস্ত খাইনা'।[১৮]

(১৫) **সততা ও আমানতদারীঃ** এ দু'টি মহৎ গুণে তিনি জাহেলী আরবে কিংবদন্তীর মত ছিলেন। সকলের মুখে মুখে তিনি 'আল-আমীন' নামে কথিত হতেন। ফলে তাঁর নিকটেই লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ে ফায়ছালার জন্য আসত। এ বিষয়ে কা'বা পুণঃ নির্মাণের সময় 'হজরে আসওয়াদ' যথাস্থানে রাখার বিষয়ে তাঁর যুগান্তকারী ফয়ছালা সর্বজন বিদিত। এমনকি কাফের নেতা আবু জাহ্ল পর্যন্ত একদিন এসে বলল, 'মুহাম্মাদ। আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিনা। তবে তোমার শিক্ষা আমার মনে ধরে না' (শিফা, কাযী আয়ায)।

আজও ইসলাম ও ইসলামের নবীকে প্রশংসা করার লোকের অভাব নেই। কিন্তু অভাব হ'ল তাঁর প্রকৃত অনুসারীর। আবু জাহ্ল নবীর প্রশংসা করা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষার অনুসারী না হওয়ার কারনে মুমিন হ'তে পারেনি। তাহ'লে আমরা কি প্রকৃত মুমিন হ'তে পারব কেবল কালেমা পড়ে ও নবীর নামে প্রশংসা গেয়ে রাস্তায় মিছিল করে? মীলাদের ও সীরাতের অনুষ্ঠান করে আর ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে? আজ উম্মতে মুহাম্মাদীর বড় কর্তব্য হ'ল শামায়েলে মুহাম্মাদী বা মুহাম্মাদী চরিত্র অর্জন করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

[সুলায়মান মনছূরপুরীর 'রাহমাতুল লিল আলামীন' অবলম্বনে]

১৭. ঐ, রিয়াযুছ ছালেহীন মিশকাত হা/ ৫৩০৪-৫।
১৮. বুখারী,' শিকার ও যবহ' অধ্যায়।

প্রবন্ধ

হারানো স্মৃতি

- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হিন্দুস্থানে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটেছে প্রধানতঃ দু'ভাবে। এক- আরব বণিক ও ওলামায়ে দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে ও দুই- ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের নেতৃত্বে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে।

ভূমধ্যসাগর হ'তে আরব সাগর হয়ে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আরব বণিকগণ সুদূর চীনদেশে বাণিজ্য করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তাদের মাধ্যমে এই দীর্ঘ সমুদ্র পথের কুলে কুলে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্র সমূহে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাদের অনেকে এসব স্থানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কেউ কেউ স্থায়ী বসতি স্থাপন করে জীবন অতিবাহিত করেন। ইন্দোনেশিয়ার মশলাকেন্দ্র মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল খুব বেশী। বলা চলে মালাক্কা কেন্দ্র থেকেই ইসলাম আরব বণিকদের মাধ্যমে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সে অঞ্চলের বৌদ্ধরা ইসলামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে কোনরূপ সামরিক অভিযান ছাড়াই ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের মিন্দানাও প্রভৃতি এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। এই অঞ্চলের মুসলমানগণ 'শাফেঈ' বলে খ্যাত। তবে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলাই শ্রেয়। একই যাত্রাপথে আরব বণিকগণ মাঝে মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরেও আসতেন। যা তখনকার দিনে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল না। জাহায ডুবির কারণে বা অন্যান্য কারণে তারা চট্টগ্রাম এলাকায় নিজেদের মধ্যকার নির্বাচিত আমীর বা সুলতানের দ্বারা স্বশাসিত কিছু এলাকাও সৃষ্টি করেছিলেন। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু লোকের চেহারার সঙ্গে আরবদের চেহারার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ এলাকার লোকদের ভাষায় আরবী, ফার্সী শব্দের আধিক্য, আলেম-ওলামার সংখ্যাধিক্য, মহিলাদের কড়া পর্দাপ্রথা ইত্যাদি তাদের প্রাচীন আরব রক্তের ছিটেফোঁটা স্বভাব হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীছ গ্রন্থে (৪/১৩৫ পৃঃ) সংকলিত বর্ণনা মতে বাংলার শাসক রাহ্মী বংশের রাজা আরবদেশে শেষ নবীর আগমনের সংবাদে খুশী হয়ে আরব বণিকদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দরবারে এক কলস আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তা নিজে খেয়েছিলেন ও ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে টুকরা টুকরা করে বন্টন

http://islaminonesite.wordpress.com

করেছিলেন। অনেক বিদ্বান বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাকে প্রাচীন রাহ্মী রাজাদের স্মৃতিবাহী এলাকা বলে সম্ভাবনা ব্যক্ত করে থাকেন।

বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচীকে যেমন আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার বলি, আদম (আঃ)-এর অবতরণস্থল হিসাবে সরন্দীপ বা শ্রীলংকাকে যেমন আরবদের শুধু নয় বরং সমগ্র মানব জাতির পিতৃভূমি বলা চলে, যেমনভাবে মক্কা থেকে মুহাদ্দিছগণের আগমন ও অবতরণস্থল হিসাবে দক্ষিণ ভারতের গুজরাটকে 'বাবুল মক্কা' বা মক্কার দ্বার বলা হয়, তেমনিভাবে আমরা বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের জন্য 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার বলতে পারি।

বলা আবশ্যক যে, আরব বণিকদের মাধ্যমে ও তাঁদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আগত ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল অবিমিশ্র ও নির্ভেজাল ইসলাম। সেখানে কোন শিরক ও বিদ'আত ছিলনা, ছিলনা বাতিল রায় ও ক্বিয়াসের ছড়াছড়ি, ছিলনা কোনরূপ মাযহাবী দলাদলি, ছিলনা কোন তরীকা ও পীর মুরীদীর ভাগাভাগি। প্রতিটি ধর্মীয় ব্যাপারেই তাঁরা সরাসরি হাদীছ থেকে সমাধান তালাশ করার চেষ্টা করতেন। যার প্রভাব আমরা আজও ভুলতে পারিনি। এখনও কোন বস্তুর সন্ধান না পেলে আমরা বলি 'জিনিসটির হদিস পাওয়া গেলনা!' সম্ভবতঃ প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বৌদ্ধদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে অথবা স্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাথে সাথে ইসলামের বিরল সাম্যের বাণী ও মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক ৬০২ হিজরী তোমাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষণ সেনের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় বাংলাদেশে অগণিত মুসলামানদের বাস ছিল, ছিল ইসলামের পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থন।

এই সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে এতদঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাক বা না পাক তাদের আক্বীদা ও আমলে ঘটতে শুরু করল এক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী বিপর্যয় যা ইন্দোনেশিয়াতে ঘটেনি, ঘটেনি অসংখ্য মুহাদ্দিছের আগমনে ধন্য গুজরাট, মালাবার তথা দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের আক্বীদা ও আমলে। আমরা এক্ষণে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব।

৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খৃষ্টাব্দে আফগান বিজেতা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী কর্তৃক দিল্লী জয় ও একই সময়ে তাঁর তুর্কী গোলাম ও সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা জয়ের ফলে উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় মুসলমানদের যে সামরিক ও রাজনৈতি বিজয়াভিযান শুরু হয় এবং এতদঞ্চলে যে সকল বিজেতা সামরিক নেতার আগমন ঘটে, তাঁদের মধ্যে আলপ্তগীন, সবুক্তগীন, কুতুবুদ্দীন আইবেক, ইলতুতমিশ, বখতিয়ার খিলজী এঁরা সকলেই ছিলেন নও মুসলিম অনারব তুর্কী গোলাম ও মাযহাবের দিক দিয়ে 'হানাফী'। পরবর্তীতে নওমুসলিম মোগল শাসকরাও ছিলেন তুর্কীদেরই একটি শাখা। তাঁদের শাসন ব্যবস্থাও ইসলামী ছিলনা। তাঁদের ছত্রছায়ায় ইরাক, ইরান, তুরস্ক তথা মধ্য এশিয়া হতে দলে দলে হানাফী ওলামায়ে কেরাম ও ছূফী সাধকদের এদেশে আগমন ঘটে। তাঁদের ত্যাগী চরিত্র ও অভিনব প্রচার কৌশলে এদেশের বহু লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু এসব বিজেতাদের ও তাঁদের অনুসরণীয় ছূফী ও আলেমদের মাধ্যমে যে ইসলাম এ দেশে প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম হতে অনেক দূরে। এখানে রায় ও ক্বিয়াসের বাড়াবাড়ি ছিল, ছিল পীরপূজা, কবর পূজা সহ বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। আলেমদের উদ্ভাবিত 'বিদ'আতে হাসানা'র সুযোগে এখানে অনুপ্রবেশ ঘটে প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু কিছু অনুষ্ঠান ইসলামের লেবাস পরিধান করে। ফলে বখতিয়ার খিলজীর সামরিক বিজয়ের প্রায় পৌণে ৬০০ বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশের মুসলমান যে মূল ও অবিমিশ্র আরবীয় ইসলামে অভ্যস্ত ছিল, তা থেকে তারা ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে এবং ছূফীদের ও রাজাদের বিকৃত ইসলামকে যথার্থ ইসলাম ভাবতে শুরু করে। যদিও ব্যতিক্রম সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে।

দক্ষিণ ভারতীয় উপকূল ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের বিকৃতি কম ছিল। পক্ষান্তরে দিল্লী হ'তে বাংলা পর্যন্ত বিশাল উত্তর-পূর্ব ভারতীয় এলাকায় প্রধানতঃ তুর্কী, আফগান ও মোগল শাসনের পৃষ্ঠাপোষকতা ও তাদের আমলে মাযহাবী আলেমদের দুঃখজনক অনুদারতা, ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে কুরআনের তাফসীর ও ইলমে হাদীছের বদলে হানাফী ফিক্হ, তর্কশাস্ত্র ও মা'কূলাতের কেতাবসমূহ সিলেবাসভুক্ত করণ, সরকারী চাকুরীতে হানাফী ফিক্হে দক্ষতা অর্জনের শর্তারোপ ও আহলেহাদীছ আলেমদের সংখ্যাল্পতার কারণে কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল ইসলাম শাব্দিক অর্থেই সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলা চলে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ)-এর সময়কাল পর্যন্ত কুরআনের তরজমা গুনাহে কবীরা গণ্য করা হ'ত। আজ

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে পৌনে দু'শ বছর আগে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪)-এর মাদরাসায় সেই সময়ে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার ছিন্নপত্র সমূহ পাঠদানের সময় ছাত্রদের নিকটে সরবরাহ করা হ'ত। অতঃপর পাঠদান শেষে জমা নেওয়া হ'ত। দিল্লীর যে মাদরাসা রহীমিয়াহ ছিল তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, তার অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য এলাকার অবস্থা কেমন ছিল সহজেই অনুমেয়। ভারতের মুসলমানেরা কি কারণে হাদীছের ইল্‌ম থেকে দূরে ছিল, নিম্নের সময় চিত্র দ্বারা কিছুটা বুঝা যাবে।

হাদীছের কেতাব সমূহের মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম যে কেতাবের আগমন ঘটে, তার নাম **মাশারেকুল আনওয়ার**। ইমাম রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/১১৮১-১২৫২ খৃঃ) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম হ'তে চয়নকৃত ২২৫৩ টি ছহীহ কওলী হাদীছের এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি সপ্তম শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে দিল্লীতে আসে। নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫ হিঃ/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) এই সংকলনটি মুখস্থ করেন। অষ্টম শতাব্দী হিজরীতে মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৭৫২ হিঃ/১৩২৫-১৩৫২ খৃঃ) দিল্লীতে এই সংকলনটির মাত্র একটি কপি মওজুদ ছিল। মুলতান তাঁর রাজকর্মচারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও মাশারেকুল আনওয়ার স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিতেন।

২-ছহীহ বুখারী ও মুসলিমঃ সপ্তম শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে সর্বপ্রথম আল্লামা শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা বুখারী (মৃঃ ৭০০/১৩০০ খৃঃ) কর্তৃক বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁয়ে আনা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম উত্তর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে বুখারী ও মুসলিমের দরস দেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর যাবত সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্বা-লাল্লাহু ও ক্বা-লার রাসূলের অমিয় সুধা পান করিয়ে বাংলা, বিহার ও আশপাশের অগণিত জ্ঞানপিপাসু মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বার ভুঁইয়াদের রাজত্বকাল (৯০০-৯৪৫/১৪৯২-১৫৩৮ খৃঃ) পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত বৎসর যাবত সোনারগাঁও ইলমে হাদীছের মারকায বা কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

এই সময় বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (৯০০-৯২৪/১৪৯৩-১৫১৮ খৃঃ) বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার সাথে সাথে ইলমে কুরআন ও ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ৯০৭ হিজরীর ১লা রামাযান মোতাবেক ১৫০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে বড় ধরনের দু'টি মাদরাসা কায়েম করেন এবং সিলেবাসে ইলমে হাদীছ অবশ্য পাঠ্য করে দেন। রাজধানী একডালার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে) জন্য ছহীহ বুখারী তিন খণ্ডে সংকলন করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে মুহাদ্দিছগণকে তিনি রাজধানী একডালাতে সমবেত করেন। ইলমে হাদীছের প্রতি এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁকে সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতের গুজরাট রাজ্যের মুযাফ্‌ফরশাহী সালতানাতের (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২খৃঃ) সঙ্গে তুলনা করা হয়। যাই হোক মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা ও তাঁর পরবর্তী হাদীছ পিপাসু ছাত্র ও শাসকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মানুষ পুনরায় তাদের হারানো ঐতিহ্য তথা হাদীছ অনুযায়ী আমলের জায্‌বা ফিরে পায়। এজন্যই যথার্থ ভাবে বলা চলে যে, উত্তর পূর্বভারতীয় উপমহাদেশে ছহীহায়নের প্রথম শিক্ষাদাতা হিসাবে বাংলাদেশ সত্যিই একটি গৌরবধন্য দেশ। -ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

(৩) **মাছাবীহঃ** ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন বিন মাস'উদ আল-বাগাভী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ) সংকলিত 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' ৮ম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে হিন্দুস্থানে আসে।

(৪) **মিশকাতঃ** অমনিভাবে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব তাবরেযী (মৃঃ ৭৩৯হিঃ) সম্পাদিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ' ৯ম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে জৌনপুর কুতুব খানায় এবং (৫) সুনানে আরবা'আহ নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এবং সুনানে বায়হাক্বী, মুস্তাদরাকে হাকেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ ৯ম শতাব্দী হিজরীতে বিহারের খ্যাতনামা মনীষী সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার জামাতা আল্লামা শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ হিঃ/১২৬০-১৩৮১ খৃঃ) হেজায থেকে আনিয়ে নেন।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, ৭ম হতে ৯ম শতাব্দী হিজরী সময়কালের মধ্যেই উত্তর ও পূর্ব ভারতে সর্বপ্রথম প্রচলিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহের আগমন ঘটে। কিন্তু ছাপার ব্যবস্থা না থাকায়, সরকারী চাকুরীতে এসবের কোন প্রয়োজন না হওয়ায়, শিক্ষার সিলেবাসে তাফসীর ও হাদীছ না থাকায় এবং আহলেহাদীছ আলেমদের সংখ্যাল্পতা ও সর্বোপরি রাজনৈতিক অনুদারতার কারণে এতদঞ্চলের মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীছের মূল ইসলাম হ'তে অনেক দূরে অবস্থান করে। এসব গ্রন্থাবলীর দু'একটি হস্তলিখিত কপি বিশেষ বিশেষ আহলেহাদীছ আলেমের নিকটেই মাত্র পাওয়া যেত, যা ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে। ফলে পপুলার (মেযলফটর) ও রেওয়াজী ইসলামকেই মানুষ প্রকৃত ইসলাম ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এর বিরোধী কিছু দেখলেই তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠতে থাকে। যেমন বিখ্যাত সাধক ও 'মাশারেকুল আনওয়ার' হাদীছ গ্রন্থের হাফেয শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৪-৭২৫ হিঃ/১২৩৬-১৩২৫খৃঃ) যখন সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের

http://islaminonesite.wordpress.com

সময়ে (১৩২০-২৫ খৃঃ) দিল্লীর সেরা আলেমদের সঙ্গে একটি মাসআলায় হাদীছ দ্বারা জওয়াব দিতে থাকেন, তখন তারা পরিষ্কার বলে দেন যে,

هند میں فقهی روایات کی قانونی حیثیت خود احادیث سے بهی زیاده هے، آپ ابو حنیفه کی رائے پیش کیجئے-

'ভারতীয় ইসলামী আইনশাস্ত্রে হাদীছের চাইতে ফিক্হের গুরুত্ব অধিক। আপনি হাদীছ বাদ দিয়ে ইমাম আবু হানীফার রায় পেশ করুন।' তৎকালীন ভারত বর্ষের সেরা ফকীহ্দের এই আচরণ দেখে শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া এই বলে দুঃখ করে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন যে,

ایسے ملك مین مسلمان کب تك باقی رهینگے جهاں ایك فرد کی رائے کو احادیث پر فوقیت دیجاتی هی ؟

'ঐ দেশে মুসলমান কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে যে দেশে একজন ব্যক্তির রায়কে হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে? আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ে (৬৯৫-৭১৫ হিঃ/১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) খ্যাতনামা মিসরী মুহাদ্দিছ শামসুদ্দীন তুর্ক হাদীছের কেতাব সমূহ নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। কিন্তু মুলতানে এসে জানতে পারেন যে, আলাউদ্দীন খিলজী ছালাতে অভ্যস্ত নন এবং তাঁর শাসনাধীনে ভারতীয় ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে ইলমে হাদীছকে বাদ দিয়ে স্রেফ হানাফী ফিক্হ চালু রাখা হয়েছে। তিনি দুঃখ করে আলাউদ্দীন খিলজীকে একটি চিঠি পাঠিয়ে মুলতান থেকে মিসরে ফিরে গেলেন। ঐ সময়ে ভারতের ৪৬ জন সেরা আলেমের মধ্যে শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ/১৩৪৬ খৃঃ) নামক মাত্র একজন আলেমের মধ্যে ইলমে হাদীছের প্রতি কিছুটা আগ্রহ ছিল। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) যখন কুরআনের প্রথম ফারসী তরজমা 'ফাতহুর রহমান' লেখেন, তখন দিল্লীর আলেমরা তাঁকে কুরআন বিকৃতির ধুয়া তুলে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া ও শাহ অলিউল্লাহ্র বিরুদ্ধে রায় ও মাযহাব পন্থী আলেমদের যে দুঃসাহস আমরা দেখেছি তা কেবল সে যুগের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আজও যাঁরা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে এই প্রকৃতির আলেমরা ও তাঁদের অন্ধ ভক্তরা সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে আছেন।

তিনটি যুগঃ

এক্ষণে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমরা তিনটি প্রধান যুগে বিভক্ত করতে পারি।-

১- **প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগঃ** ২৩ হিজরী থেকে ৩৭৫ হিজরী (৬৪৩-৯৮৫ খৃঃ) পর্যন্ত ব্যপ্ত। এই যুগে উমাইয়া খেলাফতের শেষ (১৩২ হিঃ/৭৫০ খৃঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ১৮ বা ২৫ জন ছাহাবীসহ ২৪৫ জন তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ হিন্দুস্থানের মাটিতে অবতরণ করেন। সর্বশেষ ছাহাবী সিনান বিন সালমাহ আল-হুযালী ৪৮ হ'তে ৫৩ হিজরী পর্যন্ত দামেস্কের উমাইয়া খলীফার পক্ষ হতে সিন্ধুর গভর্ণর ছিলেন। তিনি বেলুচিস্থানে শাহাদাত বরণ করেন। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন,

وكان فى عساكر بنى امية و جيوشهم فى الغزو الصالحون والاولياء والعلماء من كبار التابعين فى كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه

'উমাইয়া যুগে প্রত্যেক জিহাদী কাফেলার সাথে উঁচুদরের তাবেঈ বিদ্বানদের একটি বিরাট দল থাকতেন, যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহপাক তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন।' -(আল-বিদায়াহ ৯/৮৭ পৃঃ)। তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগে সিন্ধু এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরী মোতাবেক ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন কাসিম যখন সিন্ধু জয়ে আসেন, তখন কেবলমাত্র মুলতানের মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সেখানে ৫০,০০০ হাযার অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করতে হয়। জেরুজালেমের বিখ্যাত মুসলিম ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী আল-মাকদেসী পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম এলাকা ভ্রমণ শেষে ৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের তৎকালীন ইসলামী রাজধানী বর্তমান করাচীর সন্নিকটবর্তী সিন্ধুর মানছূরাতে এলেন, তখন সেখানকার মুসলমানদের 'মাযহাব' বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে বলেন,

اكثرهم اصحابُ حديثٍ-

'তাদের অধিকাংশ অধিবাসী হলেন আহলেহাদীছ।' বলা আবশ্যক যে, মাকদেসী নিজে ছিলেন হানাফী। শুধু সিন্ধু বা বা ভারতবর্ষ নয় ঐসময় পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম এলাকাতেও আহলেহাদীছ জনসংখ্যার আধিক্য ছিল। যেমন ইরাকের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবূ মনছূর আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) মাকদেসীর প্রায় ৫০ বৎসর পরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ায় আহলেহাদীছগণের অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

ثغور الروم والجزيرة وثغور الشام وثغور آذربيجان وباب الابواب كلهم على مذهب اهل الحديث من اهل السنة وكذالك ثغور افرقية واندلس وكل ثغروراء بحر المغرب كان اهله من اصحاب الحديث وكذلك ثغور اليمن على ساحل

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

الزنج واما ثغور اهل ما وراء النهر فى وجوه الترك والصين فهم فريقان اما شافعية واما اصحاب ابى حنيفة-

'রূম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল আবওয়াব বা মধ্য তুর্কিস্থান প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী **আহলেহাদীছ** ছিলেন। অমনিভাবে আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী সীমান্ত এলাকা সমূহের সমুদয় মুসলমান **আহলেহাদীছ** ছিলেন। একই ভাবে ইথিওপিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামন সীমান্তের সকল অধিবাসী **আহলেহাদীছ** ছিলেন। অবশ্য তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্থান এলাকার মুসলমানেরা দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল শাফেঈ ও একদল হানাফী।" লক্ষণীয় যে মাকদেসীর ন্যায় আব্দুল ক্বাহির বাগদাদীও এখানে হানাফী ও শাফেঈদের থেকে পৃথকভাবে আহলেহাদীছ-এর বর্ণনা দিয়েছেন।

২-অবক্ষয় যুগঃ ৩৭৫ হিজরী হতে ১১১৪ হিজরী (৯৮৫-১৭০৩ খৃঃ) পর্যন্ত প্রায় সোয় ৭ শত বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই যুগে ইলমে হাদীছ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে নেমে আসে অত্যাচার, নির্যাতন ও রাজনৈতিক অনুদারতার এক দীর্ঘ বিভীষিকাপূর্ণ গাঢ় অমানিশা। ৩৭৫ হিজরীর পর পরই সিন্ধুর মানছূরার শাসন ক্ষমতা আহলেহাদীছদের নিকট হ'তে কট্টর হিংসুক ইসমাঈলী শী'আরা ছিনিয়ে নেয়। তারা মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়। সমস্ত সুন্নী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়। মুহাদ্দিছগণকে সিন্ধু থেকে বের করে দেয়। ইলমে হাদীছ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে মক্কা মদীনা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যদিও পরবর্তীতে মুহাম্মাদ ঘোরী এই এলাকা জয় করেন ও তার প্রতিনিধি নাছীরুদ্দীন কোবাচা এই এলাকা শাসন করেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হিজরীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এখানে ইসমাঈলী সামারু শী'আদের আধিপত্য বজায় ছিল।

অন্যদিকে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে গযনীর শায়খ মু'ইযযুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরীর মাধ্যমে দিল্লীতে আহলুর রায় হানাফী শাসন কায়েম হয়। তখন থেকেই সিন্ধু হ'তে বাংলা পর্যন্ত কখনও তুর্কী কখনও গযনবী কখনও আফগান কখনও মোগলদের দ্বারা উপমহাদেশ শাসিত হয় এবং মূল আরবীয় ইসলামী শাসন থেকে উপমহাদেশ চির বঞ্চিত হয়। ফলে একদিকে রাজনৈতিক অনুদারতা, অন্যদিকে তাকলীদ পন্থী আলেমদের সংকীর্ণতা, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও আহলেহাদীছ আলেমদের স্বল্পতার কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষে স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবু এই সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যেও আল্লাহপাক তাঁর অবিমিশ্র দ্বীনকে কিছু সংখ্যক হাদীছ পন্থী আলেম ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁচিয়ে রাখেন।

অন্ধকারে আলো

অবক্ষয় যুগে পাঁচজন ছূফী মুহাদ্দিছের মাধ্যমে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র পরিচালিত হয়। (১) শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আলী (৬৩৪-৭২৫ হিঃ/১২৩৬-১৩২৫ খৃঃ) দিল্লীতে (২) সাইয়িদ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (৫৭৮-৬৬৬ হিঃ/১১৮০-১২৬৭ খৃঃ) মুলতানে (৩) আমীর কবীর সাইয়িদ আলী বিন শিহাব হামাদানী (৭১৪-৭৮৬ হিঃ/১৩১৪-১৩৮৫ খৃঃ) কাশ্মীরে (৪) আল্লামা শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃঃ ৭০০ হিঃ/১৩০০ খৃঃ) বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে এবং (৫) তাঁর কীর্তিমান ছাত্র ও জামাতা মাখদূমুল মুল্ক শারফুদ্দীন আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (৬৬১-৭৮২ হিঃ/১২৬৩-১৩৮১ খৃঃ) বিহারের মুনীর নামক স্থানে। মনীর পাটনা শহর থেকে পশ্চিমে ৩০ কিঃ মিঃ দূরে। ঐ পর্যন্ত বর্তমানে শহর এলাকা বর্ধিত হয়েছে। স্থানটি এখন কবর পূজারীদের দখলে। ইয়াহ্ ইয়া মানীরী পাটনা থেকে প্রায় ৯০ কিঃ মিঃ পূর্বে 'বিহার শরীফ' নামক স্থানে জীবন কাটাল ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে বিহার শরীফে আহলেহাদীছ আছে। বাকী সবাই শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত।- লেখক। অবশ্য শায়খ আহমাদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (৯৭১-১০৩৪ হিঃ/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ)-কেও আমরা এ কাতারে শামিল করতে পারি।

এছাড়া দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালওয়া, খান্দেশ, সিন্ধু, লাহোর, ঝাঁসি ও কাল্পী, আগ্রা, লাক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে ইলমে হাদীছের কেন্দ্র ছিল।

অবক্ষয় যুগে যে সকল মহান শাসক ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তাঁরা হলেন (১) সুলতান মাহমূদ গযনবী (মৃঃ ৪২১ হিঃ/ ১০৩০ খৃঃ) যিনি হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে আহলেহাদীছ হন এবং ৩৯২ হিজরীতে লাহোর জয় করে গযনবী শাসন কায়েম করেন। ৪৪৩ হিজরীতে শী'আদের হাতে গযনবী শাসনের অবসান ঘটে। (২) দাক্ষিণাত্যের বাহমনী শাসক সুলতান মাহমূদ শাহ (৭৮০-৭৯৯ হিঃ/১৩৭৮-১৩৯৭ খৃঃ), সুলতান ফিরোজশাহ, সুলতান আহমাদ শাহ (যিনি 'অলিয়ে বাহমনী' নামে খ্যাত ছিলেন), প্রমুখ হাদীছভক্ত শাসকদের যুগ চলে ৮৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০৩ বৎসর ব্যাপী। অতঃপর (৩) পার্শ্ববর্তী গুজরাটের মুযাফ্ফরশাহী সুলতানগণ ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্যাতি লাভ করেন। যদিও মোগল বাদশাহ হুমায়ুন (৯৪১-৪২ হিঃ/১৫৩৪-৩৫ খৃঃ) ১৩ মাস ব্যাপী গুজরাট অবরোধ করে রাখার ফলে 'কান্যুল উম্মালের' স্বনামধন্য সংকলক মুহাদ্দিছ আলী মুত্তাকী (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ/১৫৬৭ খৃঃ) ও মুহাদ্দিছ আবদুল্লাহ সিন্ধী (মৃতঃ ৯৯৩ হিঃ/১৫৮৫ খৃঃ) -এর ন্যায় খ্যাতনামা মুহাদ্দিছগণ গুজরাট ছেড়ে হেজায চলে যেতে বাধ্য হন। যাই হোক মুযাফ্ফরশাহী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমূদ বেগরহা (৮৬৩-৯১৭ হিঃ/১৪৫৮-১৫১১ খৃঃ) ও তাঁর পরবর্তী

http://islaminonesite.wordpress.com

সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আরব দেশ হ'তে বহু মুহাদ্দিছ গুজরাটে আগমন করেন। ফলে ৯৮০ হিজরী মোতাবেক ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১১৪ বৎসর যাবৎ সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন যোরদার থাকে। এই সময় গুজরাটকে 'বাবুল মক্কা' বা 'মক্কার দ্বার' বলা হ'ত। (৪) দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও মুযাফ্ফরশাহী যুগের সমসাময়িক বাংলাদেশেও আল্লাহপাক তাঁর এক শাসক বান্দাকে ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কবুল করেন। তিনি হলেন বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বিন সাইয়িদ আশরাফ মাক্কী (৯০০-৯২৪ হিঃ/১৪৯৩-১৫১৮ খৃঃ), যাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোকপাত করে এসেছি।

৩- **আধুনিক যুগ** (১১১৪ হিজরী হ'তে বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত)ঃ উপরোল্লেখিত মুহাদ্দিছ ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অবক্ষয় যুগে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দীপ শিখা নিবু নিবু করে হলেও জ্বলছিল। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে এসে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে ফৎওয়ায়ে আলমগীরীর অন্যতম সংকলক দিল্লীর বিখ্যাত মাদরাসা রহীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবদুর রহীমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেন উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নীরব বিপ্লব সৃষ্টিকারী বিশ্ববিখ্যাত আলেম 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'র অমর লেখক শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ)। তাঁর শানিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনী জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষ ভাবে ছহীহ হাদীছ অনুসরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাঁর পরে তদীয় স্বনামধন্য চারপুত্র শাহ আব্দুল আযীয, শাহ আব্দুল কাদের, শাহ আব্দুল গনী ও শাহ রফীউদ্দীনের শিক্ষাগুণে ও তাঁদের পরে অলিউল্লাহ পরিবারের গৌরবরত্ন মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গনী (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ/১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাসরত প্রায় ৫ কোটি আহলেহাদীছ জনগণের অধিকাংশ সেই আদর্শিক জোয়ারেরই ফসল। এ জোয়ারে কখনও কখনও ভাটা আসলেও স্রোত কখনও থেমে যায়নি। আজও বহু ভাগ্যবান পুরুষ তাক্বলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার শপথ নিয়ে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন- ফালিল্লাহিল হাম্দ। যে আহলেহাদীছদের গোস্ত-খুনে ও অস্থি-মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কিল্লা, সিত্তানা, মুল্কা, আম্বেলা, আসমাস্ত, চামারকান্দ ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ, জেল-যুলম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপ সমূহ আজও ভাস্বর হয়ে আছে। (চলবে)

ছাদেকপুর-পাটনা

(স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ও আত্মত্যাগের লীলাভূমি)

মূলঃ ক্বাইয়ূম খিযির

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী*

(এপ্রিল '৯৮ সংখ্যার পর)

মাওলানা আব্দুর রহীমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর ধৈর্য ছিল অপরিসীম। তিনি যদি আমাদের মাঝে না থাকতেন তবে আমরা সকলেই হয়ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম। আমরা সবাই একই জায়গায় থাকতাম। মাওলানা অধিকাংশ সময় শাহনেওয়ায ও হাফেযের (রহঃ) কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। এতে আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগতো। আমরা মাঝে মাঝে আতংকগ্রস্থ হ'তাম। কিন্তু মাওলানা ইয়াহ্ইয়া সর্বদা স্বাভাবিক ও উৎফুল্ল থাকতেন।

এমন অসহায় ও বন্দীদশায় মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর হিদায়াত ও নছিহত পূর্ণ তাবলীগী জায্বায় কোন বাধা বা দীনতা ছিলনা। কোন প্রহরী পুলিশ সে মুসলমান বা হিন্দু হোক, তাঁর কুঠরীর সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখলে তাকে থামিয়ে আল্লাহ্র একত্ববাদের বাণী শোনাতেন। পরকালীন শাস্তি ও কর্মফলের পরিণাম সম্পর্কে এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ উপদেশ দান করতেন, যাতে প্রহরী পুলিশ এতই প্রভাবান্বিত হ'ত যে, তার অস্থির চোখে ভীতির অশ্রুধারা প্রকাশ পেত। সে নীরব ও স্থির হয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো যে, সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে মন চাইত না।

এই সকল সম্মানিত বীর মুজাহিদদের ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর জেলের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়, সেখান থেকে যাতে তাঁদের আন্দামানে পাঠাতে পারে। মাওলানা আব্দুর রহীমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আম্বালা জেলেই রাখা হয়। ছাদেকপুরের এই বীর মুজাহিদদের আম্বালা থেকে লাহোর স্থানান্তরের সময় তাঁদের পায়ে শিকল পরিয়ে কড়া প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হ'ত, যেন পথচারী দর্শকের মনে ইংরেজ শাসনের দাপট দেখে ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু দর্শকের মনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াই হ'ত। যখন তারা দেখত যে, এঁদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে চলেছে, তখন দর্শকের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত।

* আটুয়া পশ্চিম পাড়া, বাড়ী- এ/১৬৬, ব্লক-বি, পাবনা।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বাধীনতা যুদ্ধবন্দীদের যখন টেনে হেঁচড়ে লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটের সামনে আনা হ'ত, তখন তাঁদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে দেওয়া হ'ত। জেল দারোগা ছিল একজন কাশ্মীরী হিন্দু। যখন সে স্বাধীনতা যুদ্ধের মুজাহিদগণের এই করুণ দশা দেখত, তখন তার মনে করুণার উদ্রেক হ'ত। সে তাদের কিছু কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করত। কিন্তু ইংরেজ জেল সুপার যখন গেটে আসতো এবং বন্দীদের হাতকড়া ও পায়ে শিকল পরা দেখত, তখন তার রাগের মাত্রা আরও বেড়ে যেত। সে তখন কয়েদীদের আবার লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটানোর আদেশ দিত। এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে মৌলভী মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী 'তাওয়ারীখে আজীবে' লিখেছেন,

'ওরা লোহার রড নিয়ে আসত এবং দু'পায়ের শিকলের মাঝে এক ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা লোহার আড়া বেঁধে দিত। এই লোহার ডাণ্ডা শুধু তাঁদেরই জন্য নির্ধারিত ছিল; জেলের অন্য কয়েদীদের জন্য নয়'। এই লোহার ডাণ্ডার কারণে তাঁদের চলাফেরা ও উঠা বসার খুবই অসুবিধা হ'ত। লাহোর জেলখানা থেকে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের ১৮৬৫ সালের অক্টোবর মাসে মুলতান জেলে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখান থেকে নৌপথে সাহায্যে পুনরায় করাচীর দিকে পাঠানো হয়। মুলতান ও করাচীর মাঝপথে তাঁদের আরও একটি শিকল বৃদ্ধি করা হয়। এই ভারী শিকলের চাপে যেন তাঁরা সহজে নড়াচড়া করতে না পারেন। এটি এমন কঠিন অবস্থা ছিল যে, তাঁরা ইচ্ছামত সহজে সরে যেতে পারতেন না। সাতদিন যাবৎ নৌকার উপরে নিজ অবস্থানেই পেশাব পায়খানা করতে বাধ্য হন। বন্দী অবস্থায় মুজাহিদগণ শরীরের উপর অর্ধ মন কিংবা তার চেয়ে বেশী ওজনের লোহার বোঝা বহন করে আল্লাহ্র পথে কঠিন পরীক্ষায় দুর্গম গন্তব্য পথে পাড়ি দিতে থাকেন।

মুজাহিদগণের এই অসহায় করুণ অবস্থার দৃশ্য আকাশ ও পৃথিবী নীরবে অবলোকন করতে থাকে। সিন্ধু নদের শীতল সলিল ও তরঙ্গের উপর দিয়ে তাঁদের তরী ভেসে চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্র এই নিবেদিতপ্রাণ বান্দাদেরকে ছালাত আদায় করার জন্য ওযূ করারও সুযোগ দেয়নি পাষণ্ডরা। তাঁরা লৌহ জিঞ্জিরে আবদ্ধ অবস্থায় মুলতান থেকে করাচী পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে শুধু তায়াম্মুম করেই ছালাত আদায় করেছেন। পূর্ণ এক সপ্তাহ পরে তাঁদের নৌকা করাচী বন্দরে এসে পৌঁছে। সেখানে কিছুক্ষণ বিরতির পর পুনরায় জাহাজে করে তাঁদেরকে বোম্বে পাঠানো হয়। বোম্বেতে এই গাজীদেরকে মারাঠা দূর্গে বন্দী রাখে। ১৮৬৫ সালের ৮ই ডিসেম্বরে এই সকল বন্দীদের আন্দামানের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। আন্দামান যাওয়ার পথে যখন জাহাজ শ্রীলংকার কাছে গভীর সমুদ্রে, তখন হঠাৎ আকাশের এক দৈব বিপদ তাঁদের যাত্রাকে বিঘ্নিত করে। সমুদ্রঝড়ের ধাক্কায় জাহায ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। কয়েদীদের নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য জাহাযটির পাটাতনের নীচে একটা ছোট খুপড়ীতে ঠাসাঠাসি করে রেখে দেওয়া হয়। সেখানে জাহাযের উলট-পালটে সকলের মাথা ব্যথা শুরু হলে তাঁদের বমি ও পায়খানার প্রকোপ বেড়ে যায়। এর শেষ ফল যা হবার তাই হলো। পেশাব, পায়খানা ও বমিতে খুপড়ী ভরে গেল। এই দুর্গন্ধময় নাপাক অবস্থায় সকল মুজাহিদকে থাকতে হলো। এমন অসুস্থ ও মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁরা আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে দ্বিধাহীন চিত্তে ওযূ ও তায়াম্মুম ব্যতিরেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারায় রাব্বে জলীল বারগাহে ইলাহীতে ছালাতের নিবেদন পর্ব শেষ করেন।

ইবাদতের সকল প্রকাশ্য সুযোগ সুবিধা ও সৌভাগ্য সবার জন্য বিশেষ করে সাধারণের জন্য নাও হতে পারে। আল্লাহ জুলজালাল তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য গৌরবময় স্থান দান করেন। ছালাতীদের ওযূ সহকারে সহস্র ছালাত এই খাস বান্দাদের নিবেদিত ছালাতের উপর কুরবানী হোক। এই করুণ যাত্রার গৌরবময় ঐতিহাসিক অধ্যায় শেষ হয় ১৮৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারীতে, যখন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও তাঁর সাথী বন্ধুগণ 'আন্দামান' দ্বীপের কালাপানিতে গিয়ে পৌঁছেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এই বীর মুজাহিদদের বেদনাদায়ক কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। আরও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ১৮৬৪ সালে, যখন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর বড় ভাই মাওলানা আহমাদুল্লাহ গ্রেফতার হন। ১৮৬৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী তাঁর মামলার শুনানী শুরু হয়। প্রথমে ফাঁসির রায় প্রকাশ হয়। পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে উত্তাল সাগরের ওপারে স্থানান্তরিত করা হয়। মাওলানা আহমাদুল্লাহ গ্রেফতারের পর ছাদেকপুর কেন্দ্রের নেতৃত্ব যথাক্রমে মাওলানা মুবারক আলী ও পরে মাওলানা বেলায়েত আলীর সর্বকনিষ্ট পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান যবীহ্ পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জামা'আতী বন্ধন এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে, তা পুনরায় সংগঠিত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ইংরেজ শাসকবর্গ ছাদেকপুরের প্রতিটি বাসিন্দার রক্তপাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। সুতরাং সেখানে নৈরাজ্য ও হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটতে থাকে। মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র গ্রেফতারের পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা হয়। মুসলিম সমাজে দু'টি ঈদ সকলের জন্য বিশেষ ধর্মীয় উৎসব ও আনন্দের দিন। অথচ ইংরেজ সশস্ত্র সিপাহীরা ঈদুল ফিতরের দিন ছাদেকপুর বাসীদের গৃহে অভিযান চালায় এবং তাঁদের বংশের সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রামের অবশিষ্ট বাসিন্দা যারা

http://islaminonesite.wordpress.com

মাস রোযা শেষে ঈদের মাঠে ছালাত আদায় করতে ও আল্লাহ্র দরবারে সিজদায়ে শুক্র নিবেদন করতে গৃহের বাইরে গিয়েছে আর শিশুরা বাড়ীতে আনন্দ করছে এবং মহিলারা ঈদের প্রস্তুতি শেষে আল্লাহ্র কাছে গোনাহ্ খাতা মাফ চেয়ে দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করছে। এমন সময় ইংরেজ পুলিশ বাহিনী অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করে বেপরোয়াভাবে লুটপাট শুরু করে। কুতুবখানার ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন ও হাদীছ এমনভাবে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় যে, দীর্ঘদিন যাবৎ যেন ছাইয়ের গাদায় বেদনার উদ্গীরণ ও ক্রন্দনের সুর শোনা যায়। বাড়ীর নিকটস্থ ও গ্রামের কবরস্থান যেখানে সম্মানিত ব্যক্তিদের বংশ পরম্পরায় দাফন করা হয়েছিল, সে কবরস্থান এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়, যেন সেখানে কবরস্থানের চিহ্ন পর্যন্ত ছিলনা। নিভৃত নির্জনে পর্দানশীন মহিলাদেরকে অতি নির্দয়ভাবে গৃহকোণ থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে দেয়। নিরুপায় মহিলারা নিকটবর্তী মাওলানা হাকীম ইরাদাত হোসেনের[১৩] বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র[১৪] মাওলানা হাকীম আব্দুল হামীদ পেরেশান, যিনি শহরের একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁর ঔষধের দোকানও ইংরেজ সিপাহীরা লুট করে নিয়ে যায় এবং দোকানের সকল আলমারী, শিশি ও বোতল ভেঙ্গে চুরমার করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেয়। হাকীম আব্দুল হামীদ পেরেশান শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না; তিনি একজন উন্নতমানের কবিও ছিলেন। কাব্যিক নৈপুণ্যে তাঁর এমন সম্মান ছিল যে, মাস'ঊদ আলম নদভীর 'হিন্দুস্থান কি পাহলী ইসলামী তাহরীক'-এর মুখবন্ধে মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী তাঁকে 'খাক্বানে হিন্দ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

ছাদেকপুরের ধ্বংস লীলার ইতিহাস কিছুটা জানা যায় মাওলানা পেরেশানের সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ মাছনাবী 'শাহার আশুব' কাব্যে। ইহা একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ পঞ্জী।

ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী ছাদেকপুরের বাড়ী ঘর উজাড় ও ধুলিসাৎ করে হাল চাষ দিয়ে বসতি এলাকার চিহ্ন মুছে ফেলে। এখন প্রমাণ করার উপায় নেই যে, সেখানে এক সময় মানুষের বসতি ছিল। শোনা যায়, এখন মেথর ও হরিজনদের যেখানে শুকরপাল রাখার নোংরা স্থান ও ময়লার স্তুপ রয়েছে, সেখানে মাওলানা ফারহাত হোসাইন ও অন্যান্য বুযর্গ ব্যক্তিদের মাযার ও কবর ছিল। সে স্থানে কিছু অংশে এখন মিনাবাজার বসানো হয়েছে, আর অবশিষ্ট অংশে পাটনার মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অফিস ভবন দৃষ্টি গোচর হয়। এই সেই স্থান যেখানে একদিন জান্নাত সদৃশ মহল শোভা পেত এবং যেখানে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্দ্রভূমি ছিল। এই নির্মম ধ্বংস সাধন সেই বংশের উপরে হয়েছে, যে বংশের সন্তানেরা শাহযাদার মত জীবন যাপন করত। আর এই সকল বরেন্য ব্যক্তিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল পরবর্তীতে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ।

১৩. মাওলানা হাকীম ইরাদাত হোসাইন ছাদেকপুর খান্দানের অতি নিকটাত্মীয় ছিলেন। কিন্তু আম্বালার মামলার পর তিনি ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে হিজরত করে মক্কা মু'আয্যামায় চলে যান এবং সেখানে ১৩ বৎসর বেঁচে ছিলেন। অতঃপর সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সমস্ত ছাদেকপুরের এমন কোন গৃহ অবশিষ্ট ছিলনা, যা ইংরেজ দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে নিরাপদ ছিল। এই গৃহেই হাকীম ছাহেবের পরিবারবর্গ বাস করতেন। এখনও তাঁর পৌত্র মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার ছাহেবের পুত্র সৈয়দ ইসমাঈল এডভোকেট এই গৃহেই তাঁর পরিবারবর্গ সহ বাস করছেন।

সম্মানিত ও প্রিয় মুহাম্মাদ ইসমাঈলের বড় ভাই সৈয়দ মুহাম্মাদ যায়েদ ছাদেকপুরীর সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর সঙ্গে আন্তরিক গভীরতা এমন ছিল যে, তিনি স্বাভাবিকভাবে নিয়মিত আমার গরীব খানায় আসতেন। তিনি আমার উপকারার্থে বৎসরের পর বৎসর আমার সন্তানদের শিক্ষার তদারকি করতেন। আল্লাহপাক তাঁকে কুরআন বুঝবার বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। দুঃখের বিষয় সমূহজ্ঞানের এই পণ্ডিত ব্যক্তি ১৩৯৮ হিঃ মুতাবিক ১৯৭৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর শবে কদরের শেষ রাতে তিনটার সময় ৭০ বৎসর বয়সে নিজ ভবন ছাদেকপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর লাশ মহল্লা ছাওয়ার মণ্ডী সাধারণ গোরস্থানে দাফন করা হয় (খিযির)।

১৪. মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল হামীদ পেরেশান ও কনিষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল হাকীম যাঁর বিবাহ মাওলানা আব্দুর রহীমের কন্যা রহমত বিবির সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এই সেই মাওলানা আব্দুল হাকীম যাঁর পুত্র বর্তমান জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর মাওলানা আব্দুল খাবীর ছাহেব। মাওলানা আব্দুল খাবীর ছাহেব একজন পরহেযগার, আবেদ ও সাধক পুরুষ। তৎসঙ্গে তিনি কল্যাণকামী, সমাজ সেবক ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমনই শান্ত স্বভাবের ছিলেন যে, ন্যায়-অন্যায় গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য সকল প্রশ্নের উত্তরে সদা হাসিমুখ থাকতেন। অধিকন্তু তিনি যতদূর সম্ভব সকলকে সাহায্য ও খুশী করতে সচেষ্ট থাকতেন। মাওলানা আব্দুল খাবীরের বিবাহ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ রাঞ্জুর আযীমাবাদীর কন্যার সাথে সম্পন্ন হয়। যার গর্ভে দুই সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁদের নাম যথাক্রমে হাকীম মাওলানা আব্দুল গনী ও মাওলানা আব্দুস সামী।

হাকীম মাওলানা আব্দুল গনী তাঁর পিতার দাওয়াখানায় বসতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বেচ্ছায় মানব সেবার প্রেরণা দান করেছেন। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা আব্দুস সামী বর্তমানে মক্কা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। মাওলানা আব্দুল খাবীর সালাফী উত্তম চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বর ছাদেকপুরের এই উজ্জ্বল প্রদীপ নিভে যায়। তাঁর পবিত্র মৃতদেহ 'নানমুহিয়া মীর শিকারটুলি' ঐতিহাসিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। যেখানে তাঁর নানা আন্দামানের কয়েদী মাওলানা আব্দুর রহীম যিনি الدر المنثور المعروف به بتذكره صادق پور গ্রন্থের লেখক, তাঁকে দাফন করা হয়। মাওলানা আব্দুল খাবীর ছাহেবের জানাযায় সাধারণ মানুষের ভীড় এত বেশী হয়েছিল যে, সে যুগে এমন দৃষ্টান্ত বিরল ছিল (খিযির)। বর্তমান আমীর মাওলানা আব্দুস সামী বিন আব্দুল খাবীর বিন আব্দুল হাকীম বিন আহমাদুল্লাহ বিন ইলাহী বখ্শ-এই ছিল তাঁর বংশ ক্রমবিন্যাস। -সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

যদি এঁরা জান-মাল, ঐশ্বর্য ও প্রাসাদের সুখ কুরবানী দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ বেছে না নিতেন এবং দেশে স্বাধীনতার রক্তাক্ত সংগ্রামী পথ ও ধারা সৃষ্টি করে না যেতেন, তবে এদেশের স্বাধীনতা লাভ সহজে সম্ভব হ'তনা, এ কথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

ছাদেকপুরের এমন নৃশংস ধ্বংস ও পতনের সংবাদ মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও অন্যান্য মুজাহিদ বন্দীদের নিকট যখন পৌঁছলো, তখন তাঁরা হাতকড়া ও বেড়ী পরা অবস্থায় জেলের প্রকোষ্ঠে অসহায় ভাবে পড়ে ছিলেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, যখন এই দুঃসংবাদ ঐ ছাদেকপুর মুজাহিদদের নিকট পৌঁছে, তখন তাঁদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে? কিন্তু তাঁরা এমন স্থির, সুপ্রতিষ্ঠিত মনোবল ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, সংবাদ পাওয়ার পরও তাঁদের বলিষ্ঠ সাহস বিন্দুমাত্রও দুর্বল হয়নি। এমন ব্যক্তিদের প্রতি ও তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ কোটি সালাম।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও তাঁর অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদের উপর যখন শেষ নির্যাতন ও নিপীড়ন চলছিল এবং এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মাওলানা আহমাদুল্লাহ্কে কলিকাতা থেকে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হয়। আন্দামানে পাঠানো বন্দীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাজাপ্রাপ্ত বন্দী, যাঁকে ১৮৬৫ সালের জুন মাসে পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথম জাঁকজমকের সাথে নামতে দেখা যায়। তাঁর চোখে মুখে তখনও ধৈর্য ও ব্যক্তিত্বের আলো ফুটে বের হচ্ছিল। যখন তাঁর ছোট ভাই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ১৮৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারী আন্দামান পৌঁছলেন, তখন দুই ভাইয়ের দীর্ঘ দিন পরে সাক্ষাৎ হলো। প্রথম প্রথম মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ্ এক সঙ্গেই থাকেন। ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বরে যখন মাওলানা আব্দুর রহীম আন্দামানে আসেন, তখন তিনিও এই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে 'রস্' দ্বীপে একত্রে থাকতে শুরু করেন। এই সময় মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জেল হাসপাতালে ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পর ১৮৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। এই বীর মুজাহিদের লাশ 'রস্' দ্বীপেই দাফন করা হয়।

১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল। সীমান্তের একজন পাঠান মুজাহিদ শের আলী লর্ড মেয়ো-কে হত্যা করেন। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমস্ত দ্বীপগুলিতে আতংকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'লো। যদিও এই হত্যাকাণ্ডে ছাদেকপুরের কোন বন্দী জড়িত ছিলেন না। তবুও তাঁদের একদ্বীপ হ'তে অন্য দ্বীপে পৃথক পৃথক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। মাওলানা আহমাদুল্লাহ্কে 'ভাইপার' দ্বীপে বন্দীখানায় পাঠানো হয়। মাওলানা আহমাদুল্লাহ খুব বেশী বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ছোট ভাইয়ের মৃত্যু তাঁকে আরও দুর্বল করে দেয়। তিনি অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকতেন। ফলে তাঁর দেখাশুনা করার জন্য মাওলানা আব্দুর রহীম নিজের অবস্থান থেকে দূরে তাঁর কাছে কষ্ট স্বীকার করে আসা যাওয়া করতেন। শেষে তাঁরও দিন শেষ হয়ে এলো। ১৮৮১ সালের ২১ শে নভেম্বর মাওলানা আহমাদুল্লাহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর মুজাহিদকে 'ভাইপার' দ্বীপের এক নির্জন স্থানে দাফন করা হয়। এমনি করে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মানিত মহান দু'টি ভাইয়ের জীবন আন্দামানের মাটিতে মিশে আজও তাঁদের বলিষ্ঠ কর্মের ও জিহাদী আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

মার্চ মাসে পোর্টব্লেয়ার থেকে রওয়ানা হয়ে মাওলানা আব্দুর রহীম বিশ বছর পর ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্তি পান এবং এপ্রিল মাসে পাটনা এসে পৌঁছেন। তাঁর মুক্তির আনন্দে মহল্লা মুঘলপুরা মুখরিত হয়। পাটনা সিটির মুঘলপুরা মহল্লার শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ একটি ইতিহাসমূলক কবিতা লিখেন। যে কবিতার শেষ চরণ "رهاگشتند اسیران جزایر" 'আন্দামানের মুক্তবন্দীগণ' থেকে ১৮৮৩ সালের মুক্ত বছর জানতে পারা যায়। মাওলানা আব্দুর রহীমকে কলিকাতা হতে পুলিশের কড়া প্রহরায় পাটনা নিয়ে আসা হয়। অতঃপর ষ্টেশন হ'তে তাঁকে সুপারেন্টেন্ড অব পুলিশ সিডলারের বাংলোতে নিয়ে আসা হয়। পরে তিনি সেখান থেকে নিজ মহল্লা 'নানমূহিয়া' পৌঁছেন, যেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ বাস করেন।

বন্দী জীবন হ'তে মুক্তিলাভের পর তিনি অবশিষ্ট জীবন অতীত জীবনের স্মৃতিচারণে ব্যয় করেন। আর শেষ জীবনে তিনি তাঁর বংশের সকল ঘটনা ও অবস্থার করুণ কাহিনী তাঁর রচিত الدر المنثور المعروف به تذكره صادقه গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। ছাদেকপুর খান্দানের এই জীবন কাহিনী যা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত ও সঠিক রূপে মূল্যায়িত। মাওলানা আব্দুর রহীম ঈদুল আযহার দিন ৯২ বৎসর বয়সে মাগরিবের সময় ১৯২৩ সালের ২৫শে জুলাই মোতাবেক ১৩৪১ হিজরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১১ই জিলহজ্জ সকালে তাঁর ছালাতে জানাযা সম্পন্ন হয় এবং 'নানমূহিয়া'র পৈতৃক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দেশের স্বাধীনতার জন্য ছাদেকপুরের মুজাহিদগণের আত্মত্যাগ ও কুরবানী এবং দৃঢ় সংকল্পের কথা সুবিদিত। তাঁদের তেজস্বিতা ও বীরত্বের কাহিনীর সঙ্গে বেদনাদায়ক,

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

হৃদয় বিদারক ও রক্তঝরা ইতিহাস সম্পৃক্ত। এই ঐতিহাসিক বর্ণনা শেষ করার পূর্বে ভারতের জন সাধারণ বিশেষ করে ভারতের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ- ছাদেকপুরের ঐ স্থান যেখানে মুজাহিদদের আবাসস্থল ও তাঁদের বংশগণের কবরস্থান ছিল এবং বিশেষ করে যেখান থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়, সেখানে ইংরেজ সরকার অন্যায়ভাবে ও জোর পূর্বক মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অফিস ও মিনাবাজার স্থাপন করেছে। এই ঐতিহাসিক স্থানকে জাতীয় গৌরবের স্মৃতিস্বরূপ চিহ্নিত করে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড অন্য কোন স্থানে অপসারণ করে স্বাধীনতার বীর মুজাহিদদের স্মরণে একটি জাতীয় পাঠাগার নির্মাণ করা হোক। এই গাঠাগা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করে সে যে ভাষাতেই হোক একত্রিত করা একান্ত কর্তব্য। যাতে উক্ত বিষয়ে এই লাইব্রেরী একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসাবে গণ্য হয়। আর এই পাঠাগার আগত পাঠক ও সুধীমণ্ডলীর মনে ঐ ছাদেকপুরের বীর মুজাহিদদের স্মৃতি চির জাগ্রত থাকে।

তথ্য নির্দেশ

১। Our Indian Mussalman- W.W Hunter.
২। আদ্‌দুরুল মানছূর- মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী
৩। তাওয়ারীখে আজীব- মাওলানা জা'ফর থানেশ্বরী
৪। সওয়ানেহ্ আহমদী- মাওলানা জা'ফর থানেশ্বরী
৫। মহারাজা রণজিৎ সিং- প্রফেসর কোহেলী
৬। গুলশানে পাঞ্জাব- পণ্ডিত দেবী প্রসাদ
৭। বিহার কে মুখতালিফ আদওয়ার- প্রফেসর কে,কে, দত্ত
৮। হিন্দুস্থান মেঁ ওয়াহ্হাবী তাহরীক- ডঃ কিয়ামুদ্দীন আহমাদ
৯। হিন্দুস্থান কি পাহ্লী ইসলামী তাহরীক-মাওলানা মাস'ঊদ আলম নদভী
১০। সারগুযাস্তে মুজাহেদীন- মাওলানা গোলাম রাসূল মেহের
১১। উলামায়ে হাক্ব আওর উন্‌কে মুজাহেদানা কারনামে- মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ
১২। উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী- মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ
১৩। সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রঃ)- আবুল হাসান আলী নদভী
১৪। সৈয়দ আহমাদ শহীদ (রঃ)- মাওলানা গোলাম রাসূল মেহের
১৫। হিন্দুস্তান কা রওশন্ মুস্তাক্‌বাল্- মাওলানা মুহাম্মাদ তোফায়েল মঙ্গলোরী।

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
*অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে كتاب استتابة المرتدين অধ্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াত সহকারে পরিচ্ছেদ রচনা করেন- "باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى (وما كان الله ليضلّ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) আয়নী বলেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াত দ্বারা ইংগিত করেছেন যে, খারেজী ও আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাদের দলীল গুলোর অসারতা প্রামাণিত হয়। আর এই সমস্ত যুক্তির পিছনে এই আয়াতটিই দলীল। কারণ এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করবেন না, যতক্ষণ না তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, কুফরী ফৎওয়াটি এক ধরনের ধমক বা শাস্তি। এতে যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথাকে মিথ্যা বলা হয়েছে; কিন্তু কোন কোন সময় এই মিথ্যা বলাটা সে ব্যক্তির নতুন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হয় অথবা দূরে অন্ধকার পল্লিতে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে (ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে) হয়। এরকম লোক যদি ইসলামের বিষয়কে অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে না। যতক্ষণ না উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। কখনো কখনো এও হয় যে, সে লোক উক্ত আয়াত বা হাদীছ শুনে নাই অথবা শুনেছে কিন্তু এটা তার নিকট সত্য বা নিখুঁত বলে প্রমাণিত হয় নাই অথবা এর বিপরীতে অন্য দলীল তার নিকট পৌঁছেছে, যার কারণে সে এর তাবীল করতে বাধ্য হয়েছে, যদিওবা এই তাবীলটি করতে গিয়ে সে ভুল করেছে।

আর আমি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের ঐ হাদীছটিকে স্মরণ করি, যেখানে একটি লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি যখন মরে যাব, তখন তোমরা আমাকে পুড়িয়ে দিবে,

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

কারণ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হন, তাহ'লে আমাকে এমনি শাস্তি দিবেন যা পৃথিবীর কাউকে দিবেন না। লোকেরা তার অছিয়ত অনুযায়ী তাই করল। আল্লাহপাক তাকে (জীবিত করে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা কেন করলে? সে বলল, হে আল্লাহ! আমি আপনার ভয়েই করেছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।

এই লোকটি আল্লাহ্‌র ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান ছিল (এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সম্ভব কি-না)। সে যখন মরে মাটির সাথে মিশে যাবে তখন তাকে আবার জীবিত করা হবে (এটা কেমন করে হবে)। বরং তার ধারণা ছিল যে, তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। আর এই ধারণা মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী। কিন্তু এটা তার অজ্ঞতার কারণে ছিল। তবে সে মুমিন ছিল এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করত। আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেন না। এই ভয়ের কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যারা ইজতিহাদ করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবা করার জন্য উদগ্রীব, তাদের তাবীল বেশী ক্ষমার যোগ্য।

কারও জন্য এটা বৈধ হবে না যে, কেউ ভুল করলে তার বিরুদ্ধে কোন দলীল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ও প্রমাণাদি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে। আর যখন সুনিশ্চিতভাবে কারও মুসলমান হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন কোন সন্দেহের কারণে তা বাতিল হয় না। দলীল কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এবং সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত বাকী থেকে যায়।

ইব্‌নে কুদামাহ বলেন, শরীয়তের কোন ফরয কাজকে যদি এমন কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে, যে হয় নতুন মুসলমান অথবা অমুসলিম দেশে লালিত-পালিত নতুবা সে নিবিড় পল্লী- যা শহর থেকে এবং আলেম-ওলামাদের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে বসবাস করে, এমতাবস্থায় তাকে কুফরীর হুকুম বা ফায়ছালা দেওয়া যাবে না। হাঁ যখন তাকে এটা জানিয়ে দেওয়া হবে এবং এটা (ছালাত) ফরয জেনে নিবে, এর পর যদি সে তা অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে কাফের বলা যাবে। কোন লোক যদি শহরের অধিবাসী হয় এবং আলেমদের মধ্যে বসবাস করে তাহ'লে সে শুধু কোন ফরযকে অস্বীকার করলেই কাফের হয়ে যাবে। আর এই ফায়ছালা ইসলামের সবগুলো স্তম্ভের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যেমন- যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ। কারণ এগুলো ইসলামের মূল স্তম্ভ এবং এগুলো ফরয হওয়ার দলীল গোপন থাকার নয়। কুরআন ও সুন্নাতে এর দলীল পরিপূর্ণ হয়ে আছে এবং এর উপর এজমা হয়ে গেছে। শুধু ইসলাম বিদ্বেষীরাই এটাকে অস্বীকার করতে পারে।

আর যে ব্যক্তি এমন বস্তু হালাল হওয়ার আক্বীদা পোষণ করে, যা হারাম হওয়ার উপর মুসলিম উম্মাহ একমত হয়েছেন এবং তার হুকুমটি মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেছে ও এর মধ্যে যত সন্দেহ ছিল তা কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা দূরীভূত হয়ে গেছে। যেমন- শুকরের গোস্ত, যেনা-ব্যভিচার এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়াদি যেগুলোর ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই, তাহ'লে সে কাফের। যেমনটি আমরা ছালাত তরক কারীর ব্যাপারে বলেছি। আর কেউ যদি কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা ও তার ধন-সম্পদ লুট করাকে হালাল মনে করে যে ব্যাপারে সন্দেহ বা তাবীলের অবকাশ নেই, তাহ'লে এটাও কুফরী। আর যদি কেউ তাবীল করে যেমন- খারেজী সম্প্রদায়, যদিও তারা মুসলমানদের রক্ত ও মালকে হালাল মনে করে তবুও ফকীহগণের মতে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না, এটা আমরা আগেই বলেছি। কারণ (তাদের মতে) এটা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়। এমনিভাবে আব্দুর রহমান বিন মুলজেম সে যুগের সর্বোত্তম মানুষটিকে হত্যা করলেও তাকে কাফের ফৎওয়া দেওয়া হয়নি।

বর্ণিত আছে যে, কোদামা বিন মায'ঊন হালাল মনে করে মদ্য পান করেছিলেন। তাকে আমীরুল মুমেনীন ওমর বিনুল খাত্ত্বাব কাফের বলেন নাই বরং তার উপর হদ বা শাস্তির হুকুম দিয়েছিলেন। এমনিভাবে আবু জান্দাল সহ একদল লোক সিরিয়ায় মদকে হালাল মনে করে পান করেছিল। তারা দলীল হিসাবে ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.. অর্থাৎ 'যারা ঈমান আনল ও সৎ কাজ করল, তারা যা খেয়েছে তাতে কোন দোষ নেই' এই আয়াতটিকে পেশ করেছিল। তবুও তাদের কুফরীর ফৎওয়া দেওয়া হয় নাই। পরে তারা এর হুরমত সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তওবা করে ও তাদের উপরে হদ জারী করা হয়।

অতএব যারা এই ধরনের লোক তাদের ব্যাপারে এই রকমই ফায়ছালা হবে। প্রত্যেক অজ্ঞ ব্যক্তি কোন মাসআলার ব্যাপারে জাহেল। উক্ত বিষয়টি তাকে অবগত করানো এবং সন্দেহ দূরীভূত করার পরও যদি সে এটাকে (হারামকে) হালাল মনে করে, তবেই তাকে কাফের বলা যাবে, নচেৎ নয়।

অন্যত্র তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ যাকাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে এবং তাকে অজ্ঞই মনে করা হয়, এটা তার নতুন মুসলমান হওয়ার কারণে হউক, অথবা শহর থেকে দূরে অন্ধকার পল্লীতে লালিত-পালিত হওয়ার

http://islaminonesite.wordpress.com

কারণেই হউক, তাকে কাফের বলা যাবে না। কারণ সে অক্ষম' (মুগনী ২/৪৩৫ পৃঃ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন চার প্রকার লোক দলীল-প্রমাণ পেশ করবে। (১) বধির, যে কানে কিছুই শুনে না (২) আহাম্মক বা পাগল, যার কোন বোধ শক্তি নেই (৩) অতি বৃদ্ধ, যার বোধ শক্তি ছিল তবে এখন নেই (৪) ইসলাম আসার পূর্বেই মারা গেছে এমন ব্যক্তি।

প্রথম ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ্! ইসলাম এসেছিল কিন্তু আমার শ্রবণ শক্তি না থাকায় আমি কিছুই শুনতে ও বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! ইসলাম এসেছিল তখন ছোট বাচ্চারা আমার উপরে উটের গোবর নিক্ষেপ করত। তৃতীয় ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ্! ইসলাম তো এসেছিল কিন্তু আমি এমনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, তখন আমার বোধ শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ্! আমার নিকট তো কোন মানুষই আসেননি (আমি কিভাবে ঈমান আনতাম)।

আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হ'তে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নিবেন এবং তাদের নিকট রাসূল পাঠিয়ে বলবেন যে, ওদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ যদি তাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হয়, তাহ'লে তাদের জন্য তা ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হবে। আর যারা সেখানে প্রবেশ করবে না, তাদেরকে সেখানে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে' (আহমাদ, তাবারাণী, হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ নং ১৪৩৪,২৪৬৮)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যদি চাও তবে আল্লাহ্র আয়াত وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً অথাৎ 'আমি কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করিনা, যতক্ষণ না তাদের নিকট আমি রাসূল পাঠাই।

এই হাদীছে থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে কোন রকম পাকড়াও করবেন না এবং শাস্তিও দিবেন না যতক্ষণ না তাদের নিকট রিসালাত এর দাওয়াত পৌঁছে যায় ও দলীল সাব্যস্ত হয়ে যায়।.

[চলবে]

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*-আখতারুল আমান**

ইসলাম বিধ্বংসী যে সমস্ত বস্তু রয়েছে এর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে বিদ'আত। বিদ'আত দ্বারা ইসলামের যতটুকু ক্ষতি সাধন হয়েছে অন্য কিছু দ্বারা ততটা হয়নি। এ কথা বলা বাহুল্য যে, হযরত উছমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এই দুই খলীফার নৃশংস ভাবে নিহত হওয়ার মূলে ছিল এই বিদ'আত। এজন্যই বিদ্বানগণ বলেন, শয়তানের নিকট সাধারণ গুনাহ অপেক্ষা বিদ'আতই বেশী প্রিয়।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্র দরবারে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত এর মধ্যে দু'টি শর্ত না পাওয়া যাবে। (১) ইখ্লাছ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন লক্ষ্য হ'তে হবে (২) উক্ত কাজ নবীর (ছাঃ) তরীকা মুতাবিক হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً– 'তিনি সেই সত্তা যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী' (সূরা মুলক ২)।

অত্র আয়াতে উত্তম আমলের কথা বলা হয়েছে, বেশী আমলের কথা বলা হয়নি।

ফুযায়েল বিন ইয়ায (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "أيكم أحسن عملا" এর অর্থ হল "أصوبه وأخلصه" অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে খালেছ ও সঠিক আমলকারী'। খালেছ ও সঠিক আমল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে বলেন তিনি বলেন, 'খালেছ' অর্থ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য হওয়া আর সঠিক হওয়ার অর্থ নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّه وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ– 'হাঁ (অবশ্যই) যে তার চেহারাকে আল্লাহ্র জন্য সমর্পণ করবে মুহসিন অবস্থায়, তার বিনিময় তার প্রভুর নিকটে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না' (বাক্বারাহ ১১২)। অত্র আয়াতে "من أسلم وجهه لله" এর অর্থ হল "من أخلص عمله لله" 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য তার

* লেসান্স মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. শায়খ ছালেহ আল-ফাউযানের التحذير من البدع শীর্ষক ক্যাসেট হ'তে সংগৃহীত।

http://islaminonesite.wordpress.com

আমলকে খালেছ করে' এবং "وهو محسن" এর অর্থ হল "وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم" অর্থাৎ 'সে রাসূলের অনুসারী হয়'।[২] অত্র আয়াতে উপরোক্ত দু'টি শর্তের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ'আত যেহেতু নবীর (ছাঃ) তরীকার পরিপন্থী, সুতরাং তা আল্লাহ্র দরবারে কখনই গৃহীত হবে না, যদিও এটি ইখলাছের সাথে সম্পাদিত হয়। কারণ আমল কবুলের জন্য যে দু'টি শর্ত রয়েছে তার একটি মাত্র এর মধ্যে পাওয়া যায় অপরটি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এর মাঝে শুধু ইখলাছই পাওয়া যায়। নবীর (ছাঃ) তরীকা এর মধ্যে পাওয়া যায় না। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম বিদ'আতের বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।-

বিদ'আত এর সংজ্ঞাঃ

বিদ'আত -এর আভিধানিক অর্থ হল নবাবিষ্কৃত। শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত হলঃ هى طريقة مخترعة فى الدين تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه অর্থাৎ 'বিদ'আত এমন একটি পথের নাম যা দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত এবং শরীয়ত সদৃশ, সে পথ অবলম্বন করার পিছনে উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্র বেশী ইবাদত করা।[৩]

উক্ত সংজ্ঞা থেকে একথা পরিস্ফুটিত হল যে, ধর্মের নামে ছওয়াবের আশায় যত কিছু নবাবিষ্কৃত তা সবই বিদ'আত। পক্ষান্তরে দুনিয়া সম্পর্কিত আবিষ্কৃত বস্তু যেমনঃ বিমান, ট্রেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এগুলো ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত হয়নি বরং দুনিয়াবী সুবিধার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিদ'আত -এর প্রকারভেদঃ

বিদ'আত গ্রহণযোগ্য হওয়া ও না হওয়ার দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। অর্থাৎ বিদ'আতের সবটুকুই ভ্রষ্টতা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كل بدعة ضلالة 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' (মুসলিম)।

তবে বিদ'আত বাস্তবায়নের দিক থেকে চার ভাগে বিভক্তঃ

(১) কাল বা সময়গত বিদ'আত (بدعة زمانية)ঃ যেমন- বিভিন্ন দিবস উদযাপন, বার্ষিকী পালন ইত্যাদি।

(২) স্থানগত বিদ'আত (بدعة مكانية)ঃ যেমন- হেরা গুহ বা অনুরূপ কোন স্থানে গিয়ে ছওয়াবের কাজ মনে করে ছালাত আদায় করা ইত্যাদি সবই স্থানগত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) পদ্ধতিগত বিদ'আত (بدعة كيفية)ঃ যেমন- রুকূর আগে সিজদা করা, ঈদের ছালাতের পূর্বেই খুৎবা দেওয়া, ফরয ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী মিলে হাত উঠিয়ে জোরে জোরে দো'আ করা ইত্যাদি সবই পদ্ধতিগত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার নবুঅতী জীবনে হাযার হাযার ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করেছিলেন। কিন্তু একটি ওয়াক্তেও প্রচলিত নিয়মে দো'আ করেননি। এতদসত্ত্বেও কিছু মহল উক্ত নিয়মে দো'আ করাকে সুন্নাত মনে করেন। জোরে জোরে দো'আ পাঠ করা নবীর সুন্নাত তো নয়ই বরং উক্ত নিয়মে দো'আ পাঠ করা আল্লাহ্র এই আয়াতটির প্রকাশ্য বিরোধিতার নামান্তর। আল্লাহ্ বলেন, اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনয়ী হয়ে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘন কারীদেরকে ভালোবাসেন না' (আ'রাফ ৫৫)।

(৪) সংখ্যাগত বিদ'আত (بدعة كمية)ঃ যেমন- মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আতের স্থলে চার রাক'আত পড়া, তাওয়াফ ও সাঈতে সাত -এর স্থলে ইচ্ছাকৃত ভাবে কমবেশী করা ইত্যাদি।

বিদ'আতের হুকুমঃ

সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা ও হারাম। নিম্নে তার দলীল পরিবেশিত হলঃ

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا-

'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (মায়েদাহ ৩)। উক্ত আয়াতে পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে মহানবী (ছাঃ)-এর যুগেই। তার ভিতরে কোন কিছুর সংযোজন বা বিয়োজনের অবকাশ নেই। আর বিদ'আতের অর্থই যেহেতু শরীয়তের সাথে নতুন কোন জিনিসের সংযোজন করা, কাজেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও হারাম। বিদ'আতকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই হবে আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী 'আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম'-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

২. প্রাগুক্ত।
৩. শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

২. নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة– 'তোমরা সাবধান থেক নবাবিষ্কৃত বস্তু হ'তে। কারণ প্রতিটি নবাবিষ্কৃত বস্তুই হ'ল বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হ'ল ভ্রষ্টতা'।[৪]

৩. তিনি আরো বলেন, أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة– 'নিশ্চয়ই সব থেকে উত্তম বাণী হ'ল কিতাবুল্লাহ (আল-কুরআনের বাণী), আর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হ'ল নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর আদর্শ। আর সব থেকে নিকৃষ্ট বস্তু হ'ল নবাবিষ্কৃত বস্তু। আর প্রত্যেক বিদ'আতই (নবাবিষ্কৃত বস্তু) ভ্রষ্টতা'।[৫] নাসাঈ শরীফে এতটুকু বাড়তি আছে وكل ضلالة فى النار 'আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টই যাবে জাহান্নামে'।[৬]

৪. হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে নবী (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭]

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد– 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৮]

৫. ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة– 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও লোকেরা তাকে ভাল বলে ধারণা করে'।[৯] এজন্যই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলতেন, "من استحسن فقد شرّع" 'যে ব্যক্তি নিজে থেকে কোন জিনিস ভালো ভেবে করলো সে যেন শরীয়ত প্রবর্তন করল'।[১০]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان فى الرسالة 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত এর প্রবর্তন ঘটালো উত্তম কাজ মনে করে, সে যেন এই ধারণা করল যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) রেসালতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন'[১১] (নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক)।

বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার কারণ সমূহঃ

বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার পিছনে বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কারণগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১. বড়দের ও বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ (تقليد الشيوخ والآباء)ঃ এই অন্ধ অনুসরণের দ্বারা বিদ'আত অনুষ্ঠিত হয়। মুশরিকদের কাছ থেকে তাদের সেই সমস্ত শির্কী কার্যকলাপের দলীল চাইলে কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের উপর আমল করতে বললে তারা এই বলে উত্তর দিত যে, حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'আমাদের জন্য এটিই যথেষ্ট যার উপরে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে' (সূরা মায়েদাহ ১০৪)।

২. মূর্খতা (الجهل)ঃ মূর্খতাই সকল অকল্যাণের মূল। এজন্যই নবী (ছাঃ) বলেন, طلب العلم فريضة على كل مسلم 'ইলম অন্বেষণ করা (নর-নারী) প্রত্যেকের উপরে ফরয'।[১২] মূর্খতার জন্যই শরীয়ত বহির্ভূত কাজ তথা বিদ'আত সংগঠিত হয়। হাদীছেও এসেছে আখেরী যামানায় যখন আলেম বিলুপ্ত হবে তখন মূর্খদেরকেই জনগণ নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে দ্বীনের মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে তখন তারা বিনা ইলমে ফৎওয়া দিবে।
ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১৩]

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ (اتباع هوى النفس)ঃ এটিও বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

৪. কাফেরদের সাদৃশ্য হওয়া (التشبه بالكفار)ঃ এটিও বিদ'আত ও কুসংস্কার সমাজে ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

বিভিন্ন বার্ষিকী পালন করা, বাম হাতে পানি, চা ইত্যাদি পান করা, পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও গলায় সোনার চেইন বা হার ব্যবহার করা ইত্যাদি সবই মূলতঃ বিধর্মীদের অনুসরণের ফল।

৪. আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫।
৫. মুসলিম, মিশকাত, হা /১৪১।
৬. নাসাঈ, মিশকাত আলবানী ১/৫১ টীকা নং ১।
৭. বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হা/১৪০।
৮. মুসলিম ।
৯. আবূ ইউসুফ আব্দুর রহমান আব্দুস সামাদ, আসয়েলাতুন ত্বা-লা হাওলাহাল জাদাল, পৃঃ ৫৪।
১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৫।
১১. আল-লুমা' ফির রদ্দে আলা মুহাসসিনিল বিদা'; আসয়েলাতুন ত্বা-লা হাওলাহাল জাদাল পৃঃ ৫৫।
১২. ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, হাদীছ হাসান দেখুনঃ সুনান ইবনু মাজাহ হা/২২৪।
১৩. মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা/২০৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদ'আতীদের কিছু দলীল ও তার উত্তরঃ

বিদ'আতী আলেমগণ যে সমস্ত দলীল তাদের বিদ'আতের সমর্থনে পেশ করে থাকেন, তা পর্যালোচনা সহ নিম্নে পরিবেশিত হলঃ

১- হাদীছঃ ومن ابتدع بدعة لايرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل اثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئًا

'যে ব্যক্তি এমন বিদ'আত করবে যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল পছন্দ করেন না, তবে তার উপর ওদের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে যারা আমল করবে এর উপর ....(ইবনুমাজাহ)[১৪] হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।

উক্ত হাদীছ দ্বারা বিদ'আতীরা বলতে চান যে, সকল প্রকার বিদ'আত ভ্রষ্টতা নয় বরং ঐগুলিই ভ্রষ্ট যা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ) অপছন্দ করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যে বিদ'আত পছন্দ করেন তা সম্পাদন করা যায়, তা মন্দ নয় বরং ভালো কাজ। উত্তরে আমরা বলব, যে হাদীছ দিয়ে উক্ত বক্তব্য দেওয়া হ'ল ঐ হাদীছটিই যেহেতু যঈফ, সেহেতু তা দিয়ে দলীল গ্রহণ করা বৈধ হবে না। হাদীছটি তর্কের খাতিরে ছহীহ মেনে নিলেও বিদ'আতের যে দু'ভাগ করা হল আলোচ্য হাদীছে ঐ বিভাজনের কোনই দলীল নেই। কারণ বিদ'আত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ভালো বলে স্বীকৃত নয় বরং মন্দ ও ভ্রষ্টতা বলে পরিচিত। একথা আমরা নবী (ছাঃ)-এর হাদীছ كل بدعة ضلالة 'প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' দ্বারা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি।

২। হাদীছঃ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئٌ 'মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহ্র নিকটেও ভালো আর মুসলমানগণ যে বস্তুকে খারাপ ধারণা করে তা আল্লাহ্র নিকটেও খারাপ'।[১৫] বিদ'আতীরা অত্র হাদীছ থেকে 'بدعة سيئة و بدعة حسنة দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত দুই রকম ভালো ও মন্দ'- এর স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করে। অথচ এই হাদীছটি রাসূল (ছাঃ) -এর হাদীছই নয়। বরং এটি ইবনে মাস'ঊদ ছাহাবীর উক্তি মাত্র। আর তর্কের খাতিরে হাদীছটি রাসূলের মেনে নিলেও এতে বিদ'আতীদের কোনই দলীল নেই।

কারণ উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 'মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহ্র নিকটেও ভালো'। উক্ত হাদীছে "المسلمون" এর (আলিফ লাম) 'আহদী' হ'লে তা দ্বারা ছাহাবা উদ্দেশ্য হবে। ছাহাবীগণ যা ভালো মনে করবেন তা আল্লাহ্র নিকটেও ভালো...। অথবা উক্ত "المسلمون" -এর মধ্যেকার 'আলিফ লাম' ব্যাপকতার জন্য এসেছে। তখন সমস্ত মুসলমানই উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান মিলে যা ভালো মনে করবে, তা আল্লাহ্র নিকটেও ভালো। আর বিদ'আতকে যেহেতু সমস্ত মুসলমান ভালো মনে করেনি; বরং হকপন্থী বিদ্বানগণ যুগে যুগে তার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, বর্তমানেও করছেন, কাজেই বিদ'আত ভালো বলে আর সাব্যস্ত হল না এবং উক্ত হাদীছে বিদ'আতীদের আর কোন দলীলও অবশিষ্ট রইল না।[১৬]

৩। হযরত ওমর (রাঃ) -এর নিম্নোক্ত উক্তিটি "نعمت البدعة هذه" 'এটি একটি সুন্দর বিদ'আত' -কে বিদ'আতীরা তাদের স্বপক্ষে পেশ করে থাকেন। অর্থাৎ এ থেকে অনেক বিদ'আতী বিদ'আতকে হাসানাহ (ভালো বিদ'আত) ও সাইয়েআহ্ (মন্দ বিদ'আত) এই দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষে দলীল পেশ করে থাকেন। অথচ এতে তাদের কোনই দলীল নেই। কারণ হযরত ওমর (রাঃ) ঐ কথাটি বলেছিলেন ছালাতে তারাবীহ্ জামা'আতের সাথে পড়া দেখে। আর তারাবীর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা নবী (ছাঃ) -এরই সুন্নাত।

কারণ নবী (ছাঃ) নিজে কয়েকদিন তারাবীর ছালাত জামা'আতের সাথে পড়েছিলেন। পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বীয় উম্মতের উপর তা ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে। যেহেতু নবী (ছাঃ) -এর মৃত্যুর পরে আর তা ফরয হওয়ার ভয় ছিল না, কাজেই হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত -এর কিছুদিন পর উক্ত ছালাতকে জামা'আতের সাথে পুণর্বহাল করেন। আর ঘটনা যদি তাই হয়, তবে তা কি করে বিদ'আত হল?

আর বিদ'আতীরা তাদের প্রচলিত বিদ'আতের সমর্থনে ওমর (রাঃ)-এর ঐ কথাকে পেশ করবে কিভাবে? তবে কি রাসূল (ছাঃ) তাদের ঐ বিদ'আতী কাজগুলি জীবনে দু'একবার করেছিলেন যেমনটি তারাবীর ছালাতের ক্ষেত্রে করেছিলেন? এ থেকেই প্রতীয়মান হল যে, হযরত ওমরের উক্ত কাজ অর্থাৎ তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করার নির্দেশ বিদ'আত নয়। বাকী থাকলো ওমর (রাঃ) -এর কথা 'ইহা একটি সুন্দর বিদ'আত'। উক্ত বিদ'আত দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য, শারঈ অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

১৪. হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ, দ্রষ্টব্যঃ মিশকাত (আলবানীর তাহকীককৃত) হা/১৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭।

১৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬০০; মুসনাদু আবী দাউদ ত্বায়ালেসী পৃঃ২৩; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা হা/৫৩৩।

১৬. সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যঈফা ২/১৭-১৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪। মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটিঃ من سنّ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ (مسلم)- অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে সুন্নাতে হাসানাহ্ চালু করবে সে তার ছওয়াব ও তার পরবর্তীতে যারা আমল করবে এর উপর তাদের ছওয়াব পাবে। তবে তাদের ছওয়াব থেকে কিছু কমানো হবে না। অনুরূপ ভাবে যে ইসলামের মধ্যে সুন্নাতে সাইয়েআহ (মন্দ আদর্শ) জারী করবে তার উপর তার গোনাহ ও ঐ সব ব্যক্তিদের গোনাহ বর্তাবে যারা তার পরবর্তীতে এর উপর আমল করবে। তবে তাদের গোনাহ থেকে কিছু কমানো হবে না।[১৭]

বিদ'আতীরা উক্ত হাদীছে বর্ণিত সুন্নাতে হাসানাহ্ দ্বারা বিদ'আতে হাসানাহ্ ও সুন্নাতে সাইয়েআহ্ দ্বারা বিদ্'আতে সাইয়েআহ্ এর দলীল গ্রহণ করেছেন। অথচ উক্ত হাদীছে তাদের কোনই দলীল নেই। কারণ (১) হাদীছে বলা হয়েছে من سن فى الإسلام سنة حسنة একথাতো বলা হয়নিঃ من ابتدع فى الإسلام بدعة حسنة 'যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম বিদ'আত করবে'।

তাছাড়া ইসলাম যাকে সুন্দর বলে সেটা কোনদিন বিদ'আতই হ'তে পারে না। কারণ বিদ'আত শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্দর নয় বরং মন্দ ও ভ্রষ্টতা। (২) হাদীছটি কোন্ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে উক্ত হাদীছে তারও উল্লেখ রয়েছেঃ মোযার গোত্রের লোকদের মুখে দারিদ্রের ছাপ দেখে নবী (ছাঃ) উপস্থিত ছাহাবীদেরকে তাদের জন্য ছাদকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলে কেউ দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ খেজুর ইত্যাদি নিয়ে এসে তা এক জায়গায় জমা করে। তা দেখে খুশী হয়ে নবী (ছাঃ) উক্ত হাদীছটি এরশাদ করেছিলেন।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হাদীছে বিদ'আতে হাসানার কোনই দলীল নেই।

কারণ ছাহাবীদের যে কাজ দেখে নবী (ছাঃ) উক্ত হাদীছ এরশাদ করেছিলেন সে কাজ মূলতঃ তারই নির্দেশের ফল।

বিদ'আতী ও সাধারণ গোনাহ্ সম্পাদনকারীর মধ্যে পার্থক্যঃ

১. সাধারণ গোনাহ্গার শুধু নিজের পাপ বহন করবে। কিন্তু বিদ'আতীর উপর নিজের পাপের সাথে তাদের পাপও বর্তাবে যারা তার বিদ'আতের অনুসরণ করে বিদ'আতী হবে।

১৭. মুসলিম হা/৫৩৩।

২. সাধারণ গোনাহ সম্পাদনকারী তওবা করার সুযোগ পায়। কিন্তু বিদ'আতী তা পায় না। কারণ সে তার বিদ'আতকে গোনাহের কাজই মনে করে না। বরং ছওয়াবের কাজ মনে করে। কাজেই তার তওবা করার প্রশ্নই উঠেনা।

৩. বিদ'আতী ব্যক্তি শয়তানের নিকটে অন্য পাপীদের চেয়ে উত্তম।

৪. বিদ'আতী হাউযে কাউছারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে। এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অন্য পাপীকে উক্ত পানি থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

৫. বিদ'আতীদের মতে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেনি। কাজেই ইসলামে সংযোজন ও বিয়োজনের অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে সাধারণ গোনাহকারীরা এইরূপ আক্বীদা পোষণ করে না।

৬. সাধারণ গোনাহগার দ্বারা শরীঅতের তেমন কোন ক্ষতি হয়না যেমনটি হয় বিদ'আতীর দ্বারা। কারণ তাদের দ্বারা বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ ঐ বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করে পালন করে থাকে।

বিদ'আতীর সাথে সম্পর্ক রাখার বিধানঃ

বিদ'আতীর সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাকে সম্মান প্রদর্শন করা জায়েয নয়। নবী (ছাঃ) বলেনঃ من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام (بيهقى)- 'যে ব্যক্তি বিদ'আত কারীকে সম্মান করলো সে যেন (তাকে) সহযোগিতা করলো ইসলাম ধ্বংসের কাজে'[১৮] হাদীছ হাসান।

এ জন্য সালাফে ছালেহীন বিদ'আতীদের সাথে উঠা বসা করতেন না। তাদের কোন কথা শুনতেন না। হযরত হাসান বছরী তাবেঈ (রাঃ) বলেন, তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের তথা বিদ'আতীদের সাথে উঠা বসা করো না, তাদের সাথে বিতর্কেও লিপ্ত হয়ো না এবং তাদের থেকে কিছুই শ্রবণ করো না।[১৯]

ইবনু আবীল জাওযা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পাশে প্রবৃত্তির পুজারী তথা বিদ'আতীদের কেউ থাকা অপেক্ষা বানর ও শুকর থাকা অধিক প্রিয়।[২০] আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিদ'আত মুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক দিন! আমীন!!

১৮. বায়হাক্বী ও লালাকাঈ। হাদীছটির বিভিন্ন সূত্র বিবেচনা করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' -এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। -দেখুন তাঁর তাহ্কীককৃত মিশকাত ১/৬৬।
১৯. বাকর আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ, হাজরুল মুবতাদে।
২০. প্রাগুক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাক্বামা সাহিত্যে আল-হামাদানীর অবদান

-মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক*

ভূমিকাঃ সেমিটিক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে আরবী হলো একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এটি মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার এক বিশাল জন-গোষ্ঠীর জাতীয় ভাষা। আবার এই ভাষাই হলো মুসলিম উম্মাহ্র একমাত্র ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষাতেই মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'আল-কুরআন' অবতীর্ণ হয়েছে। সকল হাদীছ গ্রন্থও এ ভাষাতে লিখিত হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই হলো আরবী গদ্য সাহিত্যের মূল উৎস। ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত আল-কুরআনকে কেন্দ্র করেই আরবী গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে। আল-কুরআনের রচনাশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরব সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে আবীদ বিন শারীয়া, ওহাব বিন মুনাব্বিহ, ইবনু ইসহাক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে ইবনু ইসহাক রচিত 'হায়াতু রাসূলিল্লাহ' নামক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আব্বাসীয় খলীফাদের দরবারে ব্যাপক সাহিত্যচর্চার ফলে আরবী গদ্য সাহিত্যে 'রম্য সাহিত্যে'র আবির্ভাব ঘটে। এ রম্য সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাবক হলেন ইবনুল মুক্বাফ্ফা। পাহলবী ভাষা থেকে অনুদিত তাঁর 'কালীলাহ ওয়া দিমনাহ' গ্রন্থটি আরবী কথা সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ। দশম শতাব্দীতে আরবী গদ্যরীতির আরও উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় গদ্য, পদ্য ও বক্তৃতার সমন্বয়ে রচিত ছোট গল্পের আকারে আরবী গদ্য সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ এক নতুন গদ্যরীতির উন্মেষ ঘটে। এটাই আরবী সাহিত্যে 'মাক্বামা সাহিত্য' নামে পরিচিত।[১]

মাক্বামার পরিচয়ঃ 'আল-মাক্বামাহ' একটি আরবী শব্দ। এর বহুবচন হলো 'আল-মাক্বামা-ত'। এর আভিধানিক অর্থ 'দাঁড়াবার স্থান'। কাল পরম্পরায় এর অর্থ দাঁড়াবার স্থান হ'তে জলসা, জলসা থেকে জলসায় উপবিষ্ট শ্রোতা, শ্রোতা থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রোতার সম্মুখে পরিবেশনযোগ্য বিষয়বস্তু ও বক্তৃতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

আরবী সাহিত্যের পরিভাষায় 'মাক্বামা' হলো- কোন কাল্পনিক ব্যক্তির ভাষায় রচিত এমন কতকগুলো ছোটগল্প, যেগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটে আদেশ, উপদেশ কিংবা রসিকতার মাধ্যমে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান মন্তব্য করেছেনঃ[২] المقامات حكايات قصيرة موضوعة على لسان رجل خيالى تنتهى بعبرة او موعظة او نكتة -

এসব মাক্বামায় একজন নায়ক ও একজন কথক থাকেন। নায়কের প্রতারণামূলক কার্যকলাপকে কথকের ভাষায় বর্ণনা করা হয়। সমাজের বিভিন্ন চিত্র এসব মাক্বামায় ফুটে ওঠে। মাক্বামা সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা হিসাবে কেউ আহমাদ ইবনু ফারেসের নাম, কেউ ইবনু দুরাইদের নাম, কেউ আল-হামাযানীর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচকের মতে আল-হামাযানীই হ'লেন মাক্বামা সাহিত্যের প্রথম সফল প্রবর্তক। নিম্নে আল-হামাযানীর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁর মাক্বামা রচনার পটভূমি ও মাক্বামা সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

জীবন বৃত্তান্তঃ আরবী সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যিক আল-হামাযানী ৩৫৮ হিজরী সনে পারস্যের 'হামাযান' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফযল আহমাদ বিন হুসাইন আল-হামাযানী। জন্মভূমি হামাযানের নামানুসারে তিনি 'আল-হামাযানী' নামে খ্যাত। কিন্তু উপমহাদেশে তিনি 'আল-হামাদানী' নামেই সমধিক পরিচিত। অভিনব মাক্বামা সাহিত্য প্রবর্তনের জন্য সাহিত্য জগতে 'বদী'উয্-যামান' বা 'যুগের বিস্ময়' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি জন্মভূমি হামাযানেই লালিত-পালিত হন।

শৈশবে হামাযানের বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অতঃপর তথাকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিদ আহমাদ ইবনু ফারেসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি আরবী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হামাযানে শিক্ষা সমাপ্ত করে ২২ বছর বয়সে মাতৃভূমি ছেড়ে তিনি 'রায়্যি' শহরে গমন করেন এবং তথায় বুয়াইয়া মন্ত্রী ছাহিব বিন আব্বাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ৩৮০ হিজরী সনে তিনি 'রায়্যি' শহর ত্যাগ করে জুরজান গমণ করেন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১। আব্দুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য (ঢাকা-১ঃ মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃঃ ১২২।

২। জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (কায়রোঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৭), পৃঃ ৩১৯।

৩। ডঃ আব্দুল হালীম আন্ নাজ্জার, তারীখুল আদাবিল আরাবী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ), পৃঃ ১১২।

http://islaminonesite.wordpress.com

তথায় ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। ৩৮২ হিজরী সনে তিনি খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে গমন করেন। এখানেই তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত সাহিত্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তথায় তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুবকর আল-খাওয়ারিযমীর সংগে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন এবং জনগণের প্রিয় ভাজন হয়ে উঠেন। অতঃপর তিনি সমগ্র খোরাসান ও সিজিস্তান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে আফগানিস্তানের 'হিরাত' শহরে এসে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তথাকার সকল কবি-সাহিত্যিকের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। অবশেষে ৩৯৮ হিজরী সনে তিনি' হিরাতেই' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪]

জ্ঞানের জগতে আল-হামাযানীর বিচরণ ছিল অবাধ। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি পঞ্চাশ-এর অধিক লাইন বিশিষ্ট যে কোন অজানা কবিতা একবার শোনা মাত্রই তা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে হুবহু পুণরাবৃত্তি করতে পারতেন, যার একটি অক্ষরেরও হেরফের হ'ত না। এ সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ, এ, আর, গীব বলেন,

Al-Hamadhani would recite a poem of more than fifty lines which he had never heard but once, remember it all and repeat it all from beginning to end without altering a letter[৫]

আল-হামাযানী একাধারে একজন কবি, সাহিত্যিক ও পত্র লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্য সংকলন 'দিওয়ানুম মিনাশ শি'র' পত্র সংকলন, 'মাজমূ'আতুম মিনার রাসা-ইল' এবং গদ্য গ্রন্থ 'মাক্বামাত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব রচনাবলীর মধ্যে গদ্য গ্রন্থ 'মাক্বামাত' রচনার কারণেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। এ সম্পর্কে Ency. Britannica গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ

"Al-hamadhani, Arabic poet and letter writer, was called Badi-al-Zaman and is chiefly famous for his establishment of the literary form of the maqama"[৬]

তাঁর মাক্বামা রচনার পটভূমিঃ 'রায়্যি' শহরে অবস্থান কালে তথাকার নানাধরণের প্রতারক ও ভিক্ষুকদের সাথে আল-হামাযানীর পরিচয় ঘটে। তিনি কিছুকাল যাবৎ তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। ফলে তিনি তাদের জীবিকা অর্জনের নানারূপ প্রতারণামূলক কৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ভিক্ষুক সমাজের এসব প্রতারণামূলক কার্যকলাপ তাঁকে অভিভূত করে। তাই তিনি তাদের জীবিকা অর্জনের এ অদ্ভুত কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে স্বীয় মাক্বামা রচনায় হাত দেন। অতঃপর তিনি নিশাপুর শহরে গমন করে ঐ অদ্ভুত চিত্রকে উপজীব্য করে ৪০০ টি মাক্বামা রচনা করেন। তাঁর মাক্বামা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে The Ency. of Islam গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ

"In Rayy Al-Hamadhani mixed with local beggars guild. It may be supposed that these contacts gave to al-Hamadhani the idea of composing certain of his first Makamat"[৭]

মাক্বামা সাহিত্যে তাঁর অবদানঃ আরবী সাহিত্যে আল-হামাযানীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল 'মাক্বামা সাহিত্যের প্রবর্তন। প্রতারক ভিক্ষুক শ্রেণীর বিভিন্নমুখী প্রবঞ্চনামূলক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর মাক্বামাগুলো রচনা করেছেন। ছন্দোবদ্ধ গদ্য, পদ্য ও বক্তৃতার সমন্বয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে রচিত তাঁর মাক্বামা সমূহের অভিনব গদ্যরীতি তৎকালীন আরবী সাহিত্য জগতে এক বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং তাঁকে 'বদী উয্-যামান' বা 'যুগের বিস্ময়' উপাধিতে ভূষিত করে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আর. এ. নিকলসন বলেছেনঃ

'The credit of inventing, or at any rate of making popular, a new and remarkable form of composition in this style belongs to al-Hamadhani on whom posterity conferred the title, `Badiu-L-Zaman' i.e. the wonder of the Age.[৮]

আল-হামাযানী রচিত মাক্বামা সমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক হান্না আল-ফাখূরীর বর্ণনা মতে ৫১টি, ডঃ আব্দুল হালীম আন-নাজ্জারের বর্ণনা মতে ৫২টি এবং আহমাদ হাসান আয-যাইয়াতের বর্ণনা মতে ৫৩টি মাক্বামার সন্ধান পাওয়া যায়।

৪। উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৬৮). পৃঃ ৫৯৬।

৫। H.A.R.Gibb, Arabic literature (Oxford: The clarendon press, 1963),p.100.

৬। William Benton, Encyclopaedia Britannica (Chicago: Encylopaedia Britannica Inc,1768),p.23.

৭। E.J. Brill, The Encyclopaedia of Islam (London: Luzac and co. 1971),p.106.

৮। R.A. Nicholson, A Literary history of the Arabs (Cambridge: University press, 1962), p.328.

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনি তাঁর এ সকল মাক্বামায় বুয়াইয়া শাসনামলের প্রতারক ভিক্ষুক শ্রেণীর বহুমুখী প্রতারণামূলক কার্যকলাপ বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। ভিক্ষুক শ্রেণীর এসব কার্যকলাপকে উপস্থাপনের জন্য তিনি তাঁর রচনায় আবুল ফাত্হ আল-ইস্কান্দারী নামক এক কাল্পনিক ব্যক্তিকে নায়ক রূপে নির্ধারণ করেছেন। নায়কের বিচিত্র অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি তৎকালের প্রবঞ্চক ভিক্ষুকদের জীবনালেখ্যকে তাঁর মাক্বামা সমূহে তুলে ধরেছেন। এ নায়ককে তিনি সকল বিষয়ে পারদর্শী একজন ভবঘুরে, প্রতারক, কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি রূপে উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে সাহিত্যিক আবুল কাসেম বলেছেনঃ[৯]

انما هى عبارة عن حكايات يكون بطلها احيانا دينا زاهدا واعظا، واحيانا منافقا مخادعا، واحيانا شاعرا خطيبا وعالما اديبا -

উক্ত নায়ক বিভিন্ন ছদ্মবেশে কোন না কোন মজলিসে জনসাধারণের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং সুযোগ পেলেই তাঁর প্রতারণামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে ধোকা দিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। তাই আমরা তাঁর মাক্বামা গুলোতে দেখতে পাই যে, উক্ত নায়ক কখনো দলপতি সেজে লোকদেরকে উপদেশ দেন, আবার কখনো ইমামের রূপ ধরে বক্তৃতা প্রদান করেন। কোন সময় তিনি ধার্মিকের পোশাকে আবৃত হয়ে ধর্মোপদেশ দেন, আবার কোন সময় মুজাহিদ রূপে মানুষকে জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। আবার কোন মাক্বামায় কবি সেজে স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে জনগণকে মুগ্ধ করেন।

নায়কের এসব কীর্তিকলাপ বর্ণনা করার জন্য আল-হামাযানী কথক হিসাবে ঈসা বিন হিশাম নামক এক কাল্পনিক ব্যক্তিকে উপস্থাপন করেছেন। ঐ কথকের ভাষার মাধ্যমে তিনি স্বীয় মাক্বামার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাই দেখা যায়, এ কথক প্রতিটি মজলিসে হাযির হয়ে ঐ ছদ্মবেশী নায়কের প্রতারণামূলক বক্তৃতা শ্রবণ করে। বিভিন্ন ছদ্মাবরণের মাঝেও সে নায়ককে চিনতে পারে এবং তার প্রতারণামূলক কার্যকলাপকে ধরে ফেলে। কথক তাকে এরূপ প্রতারণা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে নায়ক স্বীয় কার্যকলাপের সমর্থনে কথককে কোন না কোন উপদেশ দিয়ে উক্ত মজলিস ত্যাগ করেন।

৯। আবুল কাসেম, শাখছীয়্যাতুন আদাবিইয়াহ (বৈরুতঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৬), পৃঃ ২১০।

এভাবে বিভিন্ন মজলিসে প্রদর্শিত নায়কের বিচিত্র কীর্তিকলাপকে উপজীব্য করে কথকের মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে তিনি তাঁর মাক্বামা সমূহ রচনা করেছেন। তাঁর মাক্বামা গুলোর মধ্যে 'আল-মাক্বামাতুল ক্বারীযিইয়াহ', 'আল-মাক্বামাতুল আযাযিইয়াহ', 'আল-মাক্বামাতুল বলখিইয়াহ', 'আল-মাক্বামাতুস সিজিস্তানিইয়াহ', 'আল-মাক্বামাতুল কূফীইয়াহ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১০]

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে শুরু করে সমাজ ও সাহিত্য ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আল-হামাযানীর মাক্বামাগুলো রচিত হয়েছে। কোন মাক্বামায় তিনি বন্ধু-বান্ধবের প্রশংসা, আবার কোন মাক্বামায় পৃষ্টপোষকদের স্তুতি বর্ণনা করেছেন। কোন মাক্বামায় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে, আবার কোন মাক্বামায় কবিতা ও কবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোন মাক্বামায় অর্থ-সম্পদের, আবার কোন মাক্বামায় ফলমূলের বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবে বিভিন্নমুখী বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে তিনি তাঁর মাক্বামাগুলি রচনা করেছেন। নমুনা হিসাবে নিম্নে তাঁর রচিত 'আল-মাক্বামাতুল কারীযিইয়াহ'-এর ভাবার্থ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

ঈসা বিন হিশাম বলেন দরিদ্রতা আমাকে সুদূর জুরজান শহরে নিক্ষেপ করে। তথায় আমি কিছু সম্পদের মালিক হই। সেখানে একটি দোকান তৈরী করি। একদিন অদূরে বসে ছিল এক অচেনা মুসাফির। সে আমাদের আলোচনা শুনছিল। আলোচনা গভীরে পৌঁছলে আমাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। তখন ঐ মুসাফির আকস্মাৎ আমাদের আলোচনায় যোগ দেয়। যুক্তিপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর আলোচনার মাধ্যমে সে আমাদেরকে অভিভূত করে দেয়। আমরা তার কবিতা শুনতে চাই এবং তার পরিচয় জানতে চাই। তৎক্ষণাৎ সে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাদেরকে তাক লাগিয়ে দেয়। উক্ত কবিতায় তার পরিচয় পেশ করে স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানাদির দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে আমাদের কাছে কিছু অর্থ-কড়ি প্রার্থনা করে। তখন আমরা তাকে সাধ্যমত সাহায্য করি। অতঃপর বিদায় নিয়ে সে গন্তব্য পানে রওয়ানা দেয়। সে সময় হঠাৎ আমি তাকে চিনে ফেলি। তার গতিরোধ করে প্রশ্ন করি, 'তুমি কি আবুল ফাত্হ নও? তুমি তো এখনো বিয়েই করনি। তোমার স্ত্রী আসলো কোথা থেকে?' তার প্রতারণা ধরা পড়ায় সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

১০। আবুল ফযল বদী'উয্যামান আল-হামাযানী, মাক্বামাত (বৈরুতঃ আল মাতবা'আতুল কাসূলীকীইয়হ, ১৮৮৯), পৃঃ ১-২৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

আর উপদেশের সুরে আমাকে বলে, সময়োপযোগী বেশ ধর এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলো'।[১১]

মূল্যায়নঃ আল-হামাযানী রচিত মাক্বামাগুলি আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মানব জীবনের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-দুর্দশা, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা সমৃদ্ধ তাঁর এ মাক্বামাগুলো পাঠকবর্গকে সহজেই আকৃষ্ট করে। ফলে এসব আনন্দদায়ক, রসাত্মক ও উপদেশধর্মী মাক্বামার জনপ্রিয়তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুদূর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তাঁর মাক্বামা সমূহ অপূর্ব ভাবাবেগ মন্ডিত ও শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ। আল-কুরআনের আয়াত, প্রবাদ বাক্য ও উপদেশ সংযোজনের দরুন এ সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি ঘটেছে। ভাবের গভীরতা, শব্দের মাধুর্য, বর্ণনার চমৎকারিত্ব, পদ্য সংযোজন, বক্তৃতা প্রভৃতি গুণাবলীর দ্বারা এগুলো নাটকীয় পদ্ধতিতে এক অভিনব ছন্দোবদ্ধ গদ্য সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। গদ্য, পদ্য ও বক্তৃতার সংমিশ্রণে রচিত আল-হামাযানীর মাক্বামাগুলো এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, যার নযীর আরবী সাহিত্যে বিরল। তিনি মাক্বামা রচনার ক্ষেত্রে এমন খ্যাতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন যে, পরবর্তী কালের মাক্বামা লেখকগণ তাঁদের মাক্বামা রচনার ব্যাপারে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এদিক দিয়ে তাঁকে সকল মাক্বামা রচয়িতার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবুল কাসেম বর্ণনা করেছেনঃ[১২]

وكان هذا النوع من الادب الذى اخترعه بديع الزمان فى المشرق ناجحا فى عصره وما بعد عصره حتى قلده بعض الادباء –

আল-হামাযানী রচিত মাক্বামাগুলো অতি অল্প সময়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। এত সব খ্যাতি সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি এবং প্রতারণামূলক বিষয়বস্তুর দরুন অনেকেই এগুলোর বিপক্ষে সমালোচনা করেছেন।

কোন কোন সমালোচক আল-হামাযানীর মাক্বামাগুলোতে গল্পের সংক্ষিপ্ততা এবং প্রত্যেক গল্পে প্রায় একই ধরণের ভাবধারা বর্ণিত হওয়ায় এগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, এ মাক্বামাগুলোতে গল্পের বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে গল্পের সৌন্দর্যের দিকে বেশী জোর দেয়া হয়েছে।

১১। তদেব, পৃঃ ১-৫।
১২। আবুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

ইংরেজ সমালোচক আর. এ. নিকলসন বলেনঃ Each maqama forms an independent whole, a medley of prose and verse in which the story is nothing, the style everything.[১৩]

সমালোচক ইবনুত্ তিক্‌তিকী বলেন, গদ্য ও পদ্যের রচনা পদ্ধতি উপলব্ধিকরণ এবং সাহিত্য রচনার অনুশীলন শিক্ষাদান ছাড়া মাক্বামা সাহিত্য আর তেমন কোন উপকারে আসে না। এটা ভিক্ষাবৃত্তি ও প্রতারণার উপরে রচিত বলে পাঠকবর্গকে হীনমনা ও পশ্চাদপদ করে তুলতে সাহায্য করে। সুতরাং এটা একদিকে উপকার করলেও অন্যদিকে ক্ষতি সাধন করে যথেষ্ট।[১৪]

আবার অনেকেই এর স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। যেমন ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয্-যাইয়াতের মতে- সুন্দর কাহিনী বর্ণনা, আকর্ষণীয় উপদেশ প্রদান এবং নৈতিক জ্ঞান দান মাক্বামার উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য হলো নতুন নতুন শব্দ ও অভিনব রচনাশৈলী শিক্ষাদান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন[১৫]

وليس الغرض من المقامة جمال القصص ولاحسن الوعظ ولا افادة العلم– وانما هى قطعة ادبية يقصد بها الفن للفن–"

বিভিন্ন সমালোচক আল-হামাযানীর রচনার বিরুদ্ধে ভিক্ষাবৃত্তি ও প্রতারণার যে অপবাদের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা ঠিক নয়। কারণ তাঁর রচনায় এগুলোর উপস্থাপনা ছিল অনেকটা অভিনব বর্ণনা কৌশল এবং রস সৃষ্টির মাধ্যম মাত্র। সুতরাং এ অপবাদকে ভিত্তিহীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। যদিও সমালোচকগণ আল-হামাযানীর মাক্বামার বিপক্ষে সমালোচনা করেছেন, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আরবী সাহিত্য জগতে তাঁর মাক্বামা এক অনন্য সৃষ্টি। ভাষার সাবলীলতা, ছন্দের মাধুর্য, নিপুণ শব্দ সম্ভার, অনুপম রচনাশৈলী, পদ্য সংযোগ, কুরআনের আয়াত, আরবী প্রবাদ বাক্য এবং দুষ্প্রাপ্য শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিনি তাঁর মাক্বামার চরম উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর অভিনব রচনা পদ্ধতির বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহিত্যিক আবুল কাসেম বলেন,[১৬]

১৩। R, A. Nicholson, op.cit.p.329,
১৪। হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী (মিসরঃ আল-বুলিয়া), পৃঃ ৭৩৮।
১৫। আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (মিশরঃ দারুন নাহযাহ), পৃঃ ৩৯৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

اما اسلوبها فكله مسجع موصوف بالامثال والاشعار - وكل واحدة منها تعتبر قطعة ادبية -

আকর্ষণীয় বক্তব্য ও অভিনব রচনা পদ্ধতির কারণে তাঁর মাক্বামাগুলো জন্মলগ্ন হ'তে অদ্যাবধি আরবী সাহিত্যে এক আকর্ষণীয় সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এগুলোর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এগুলোকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ইংরেজী ছাড়াও পৃথিবীর বহু ভাষায় এ মাক্বামাগুলো অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলোকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মিসরের বিখ্যাত সাহিত্যিক মুহাম্মাদ আব্দুহু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ এবং মুহাম্মাদ আর-রাফেঈ টীকা-টিপ্পনীসহ আল-হামাযানীর মাক্বামাগুলো প্রকাশ করেছেন।[১৭]

উপসংহারঃ 'মাক্বামা সাহিত্য' আরবী সাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি। এ সাহিত্য প্রবর্তনে আল-হামাযানীর অবদান চির অম্লান। কবিতা, বক্তৃতা, উপদেশ, প্রবাদবাক্য, কুরআনের আয়াত প্রভৃতির সমন্বয়ে ছন্দোবদ্ধ গদ্যের মাধ্যমে মাক্বামা রচনা করে তিনি আরবী সাহিত্যে এক অভিনব শাখার প্রবর্তন করেন। তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনেক মাক্বামা রচনা করে আরবী সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি করেছেন এবং এ ভাষাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তিনি তাঁর প্রতিটি মাক্বামায় একজন নায়ককে উপস্থাপন করে নাটকীয় ভঙ্গীতে গল্পগুলোকে অলংকৃত করেছেন। গদ্যও পদ্যের সমন্বয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি এমন এক সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন, যা ইতিপূর্বে কোন সেমিটিক জাতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। এ অভিনব সাহিত্য প্রবর্তনের কারণেই তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট বিশেষতঃ আরবী সাহিত্যানুরাগীদের নিকট সমাদৃত হয়ে আছেন। পৃথিবীতে যতদিন মাক্বামা সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত থাকবে, ততদিন আরবী সাহিত্যানুরাগীদের নিকট তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক আর, এ, নিকলসন যথার্থই বলেছেন,

In his maqama we find some approach to the dramatic style, which has never been cultivated by the semites.[১৮]

১৬। আব্দুল কাসেম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।
১৭। ডঃ আব্দুল হালীম আন-নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।
১৮। R.A. Nicholson op. cit.p. 328.

যমুনা বহুমুখী সেতু ঃ দীর্ঘ স্বপ্নের বাস্তবায়ন

*মুহাম্মাদ আবু আহসান**

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় কৃতিত্বপূর্ণ ও বড় অর্জন হ'ল যমুনা বহুমুখী সেতু। বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ (৪.৮ কিলোমিটার) এ সেতুটি নির্মাণের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ দিনের ইতিহাস। দৃঢ় সংকল্প, রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং সদিচ্ছা ছাড়া এতবড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন যে সম্ভব নয় এ সত্যটি যমুনা সেতু নির্মাণের পেক্ষাপট ও ইতিহাসের পর্যালোচনা থেকে সহজেই বেরিয়ে আসে।

যমুনা সেতুর স্বপ্নের বিবরণ জানতে হ'লে আমাদের যেতে হয় অতীত ইতিহাসের দিকে। আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই সময়ের কথা যখন ইসলামের সূচনাপর্ব থেকে সুদূর আরব তথা মধ্যপ্রাচ্য থেকে দাওয়াতী কাজে পৃথিবীর নানা জনপদে ছড়িয়ে পড়েন ইসলাম প্রচারক সিপাহসালারগণ। তারা পাহাড়-পর্বত-জঙ্গল পেরিয়ে ইসলামের দাওয়াতী তাকীদে জীবন কুরবান করেছেন। তাদের একজন হ'লেন বঙ্গবিজয়ী ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা পূর্ব বাংলায় অভিযান করতে এসে বাধাগ্রস্থ হয়েছেন বিশাল প্রমত্তা যমুনা ও পদ্মা নদী দ্বারা। তখনকার দিনে দিল্লী থেকে বিশাল সুলতানী সেনাবাহিনী ও মুঘল বাহিনীর যাত্রা মন্থর হ'ত যমুনা নদীর তীরে। যমুনা পার হওয়ার উপায় তারা বেরও করেছিলেন। একটি নৌকার সাথে আর একটি নৌকা বেঁধে যমুনাসহ বাংলার বিদ্রোহীদের দমনের পথে যত নদী সামনে পড়ত, তত নদীই শত শত নৌকা দিয়ে তৈরী সেতু দ্বারা পারাপারের ব্যবস্থা করা হ'ত। যমুনা বহুদিনের প্রতিবন্ধক। আর যমুনা সেতুর স্বপ্নও দেখেছিলেন বহু বছর আগে মুসলিম সেনানায়করা, যাদের পদাংক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ।

উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ অপরিহার্য ছিল বহুকাল আগে থেকেই। এই সত্যটি বহুকাল আগে উপলব্ধি করেছিলেন যেমন মুসলিম শাসকগণ তেমনি যুগের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক যুগের শাসকগণ। দেশ বিভক্তির পরে যমুনা সেতু নির্মাণের প্রথম দাবী ওঠে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। ১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানী এটিকে প্রথম রাজনৈতিক দাবীতে পরিণত করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে যমুনা সেতু নির্মাণের দাবী অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আব্দুর রহমান, রেলওয়ে, পানি ও সড়ক যোগাযোগমন্ত্রী নওয়াব খাজা হাসান আসকারীর পক্ষে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত রংপুরের মুহাম্মাদ সাইফুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত হ'লে সরকার যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের সমীক্ষা চালাবে। ১৯৬৬ সালের ১১ জুলাই প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে রংপুর-৯ নির্বাচনী এলাকার সদস্য শামসুল হক যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন, যা সর্বসম্মত ভাবে পাস হয়।

* তৃতীয় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

এটিই ছিল যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের প্রথম আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত।

১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নিয়োজিত 'ফ্রি ম্যান ফক্স এণ্ড পার্টনার' নামে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যমুনার উপর সেতু নির্মাণের প্রাথমিক সম্ভীক্ষা চালায়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবগুলি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণকে অন্তর্ভূক্ত করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবর রহমান তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কথা পূর্ণব্যক্ত করেন এবং তিনি জাপান সফরে গেলে তৎকালীন জাপানী প্রধানমন্ত্রী তাকুই তানাকার কাছে যমুনার ওপর একটি সেতু তৈরিতে জাপানের সাহায্য কামনা করেন। ১৯৭৬ সালে সেতুর প্রথম সম্ভাব্যতা যাচাই করতে আসে জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এজেন্সী (জাইকো) এবং তাঁকে একটি রিপোর্ট পেশ করে। পরবর্তীতে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে আর্থিক সহায়তা না পেয়ে যমুনা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। অতঃপর এরশাদ সরকারের আমলে সেতু নির্মাণে নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ১৯৮৪ সালে গ্যাস বিদ্যুৎসহ সড়ক সেতু নির্মাণের সুপারিশ করে। ফলে ঐ বছরই মন্ত্রী পরিষদে যমুনা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় 'যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ', যার তত্ত্বাবধানে বর্তমান বঙ্গবন্ধু সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রেসিডেন্টে এরশাদ সেতু নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য ঐ বছরই যমুনা লেভি ও সারচার্জ অধ্যাদেশ জারি করেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ১২ ফ্রেব্রুয়ারী তিনি যমুনা সেতুর প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৮৬ সালের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর উঠে আসে সম্ভাব্য ৭টি স্থানের নাম সিরাজগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ, আরিচা, মাদারগাঁও, মাওয়া ইত্যাদি। ১৯৮৯ সালে চূড়ান্ত সম্ভাব্যতায় শেষমেষ টিকে যায় সিরাজগঞ্জ।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে ১৯৯১ সালে সেতু নির্মাণের কাজ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ১৯৯৪ সালের জুন মাস পযর্ন্ত লেভী ও সারচার্জ বাবদ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৮ কোটি টাকা। ১৯৮৫-১৯৯৩ পর্যন্ত সময়ে বিস্তারিত আর্থকারিগরী সমীক্ষা পরিচালনা করার পর ১৫.২.৯৪ ইং তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের সংগে ১৮.৩.৯৪ ইং তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সংগে এবং ১৪.৬.৯৪ ইং তারিখে জাপান সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের এই সেতু সংক্রান্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রস্তাবিত সেতুর পশ্চিম দিক সিরাজগঞ্জের সায়েদাবাদে এবং পূর্বদিকে কালিহাতির শ্যামশৈলে দু'টি নতুন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর সেতুর কাজ শুরু হয় ১৯৯৪ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে। সেতুর ৬০% কাজ বি,এন,পি সরকারের আমলেই শেষ হয়। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার সেতুর কাজ দ্রুত সুসম্পন্ন করার জন্য তৎপর হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সেতুর মূল কাজ সমাপ্ত করে গত ২৩ জুন'৯৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

যমুনা সেতু উদ্বোধনের কিছুদিন আগে এবং বর্তমানেও জনমানুষের মনে প্রশ্ন যমুনা সেতুটির স্বপ্ন প্রথম কে দেখেছিলেন? গত ২৩ জুন সেতুটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবী করেছেন যে, এই সেতু তার পিতার স্বপ্ন ছিল এবং তার নির্বাচনী ওয়াদা ছিল। অথচ রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেই যমুনা সেতুর বিল প্রথম পাশ হয় এবং জাপানী সহায়তায় এর ফিজিবিলটি রিপোর্টও তৈরী হয়। আর বাংলাদেশের মানুষ বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের মানুষ ১০০ বছর আগে থেকেই যমুনা সেতুর স্বপ্ন দেখে আসছে, কামনা করে আসছে এপার বাংলা ওপার বাংলার সংযোগ। কোন একজনকে ঘিরে নয় উত্তর বঙ্গের কোটি মানুষই যে যমুনা সেতুর প্রথম ও প্রকৃত স্বপ্নদ্রষ্টা, তা মানতে আমাদের কোন রাজনৈতিক নেতা, কোন বুদ্ধিজীবি, কলামিষ্ট বা কোন ইতিহাসবিদ আদৌ রাজি হবেন কি? কেন হবেন না? আমার মনে হয় তারা সাধারণ মানুষ, ভোটদাতা জনগণ ও অশিক্ষিত বলে। নয়তো কোন শক্তিশালী দলের নেতা বা নেত্রী নন বলে।

সেতু শব্দের ব্যবহারিক অর্থ দাঁড়ায় সংযোজনকারী। যমুনা নদী দ্বারা বিভাজিত বাংলার প্রথম সংযোজনের স্বপ্নদ্রষ্টা তাহ'লে কে? যমুনার সংযোজক কি শুধু এই শতাব্দীর চিন্তার ফসল? তবাক্বাত-ই-নাসিরী, আইন-ই- আকবরী, জাহাঙ্গীর নামা, বাহারিস্থানই-গাবীসহ সুলতানী ও মুঘল আমলের লেখা ইতিহাস পাঠে আঁচ করা যায় বর্তমান যমুনা সেতুর স্বপ্নদ্রষ্টা কে বা কারা? সন্দেহ নেই, প্রায় ৮শ বছর আগে মুসলিম বিজয়ীরা যমুনা সেতুর স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর সেই সময়ই হাতি, ঘোড়া, গরু, খচ্চর, গাধা, উট আর বিপুল সৈন্য পারাপারের জন্য ব্যবহার হতো নাওয়ারা বা নৌকা সেতু। শত শত বছর আগে প্রকৌশলীরা কংক্রিট দিয়ে নির্মাণ করতে পারেননি যমুনা সেতু। তবু তারা যমুনা সেতুর স্বপ্ন দেখেছেন। তাৎক্ষণিক 'নাওয়ারা সেতু' তৈরীও করেছেন।

শিল্পী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দাভীঞ্চি যদিও দুই হাযার বছর আগে উড়োজাহায নিমার্ণের স্বপ্ন দেখেছেন আর যার বাস্তবায়ন হলো এই সেদিন। তবু তিনি যদি উড়োজাহায নির্মাণের ইতিহাসে জনকের ভূমিকায় থাকেন তাহ'লে আমরা কেন ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি কিংবা দিল্লীর সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনকে যমুনা সেতুর স্বপ্ন দ্রষ্টা ভাবব না?

পরিশেষে বলতে চাই যে, যমুনা সেতু এ দেশের গণমানুষের যুগ যুগ ধরে লালিত স্বপ্নের ফসল। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যারা যতটুকু অবদান রেখেছেন, আমরা সকলের অবদানকে উদার মনে স্বীকার করব। কোনরূপ ঈর্ষার মালিন্য ও সাফল্যজাত অহমিকা যেন আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে। যমুনা সেতু উদ্বোধনের এ শুভ মুহূর্তে আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, এমপি এ শামসুর রহমান, শামুসুল হক, প্রেসিডেন্ট এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে। শুভেচ্ছা জানাই সকল দাতা সংস্থা, দেশী-বিদেশী প্রকৌশলী, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরকে। রুহের মাগফিরাত কামনা করি সেতু নির্মাণে নিহত শ্রমিক ভাইদের।

[দৈনিক ইনকিলাব, সাপ্তাহিক যায় যায়দিন, দৈনিক মানবজমিন ও সাপ্তাহিক অহরহ অবলম্বনে।]

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ছাহাবা চরিত

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)

-মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান*

সার সংক্ষেপঃ

[আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্‌র অন্যতম ছাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটতম ছাহাবী এবং বাল্যকালের পরম বন্ধু। তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবী ছিলেন। তাঁর কারণেই কুরাইশ সিংহ হযরত উমর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন। বদর যুদ্ধ ব্যতীত ওহোদ, খন্দক, হুদায়বিয়া সহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ব্যতীতই গণীমতের পুরোপুরি অংশ লাভ করেছেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ের ঝান্ডা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে জান্নাতী বলে শুভ সংবাদ প্রদান করেন। তাঁর থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি একাধারে একজন শাসক, সাহসী বীর যোদ্ধা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এমন একজন ছাহাবীর জীবন চরিত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ সদৃশ। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন।[১] তাঁর প্রকৃত নাম সাঈদ। কুনিয়াত 'আবুল আওয়ার', কারো কারো মতে 'আবু ছাওর'।[২] তবে প্রথমোক্ত কুনিয়াতেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পিতার নাম যায়েদ। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হলঃ সাঈদ ইবন যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল ইব্‌ন আব্দুল ওয্যা ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কুর্ত্ব ইব্‌ন রাযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লুওয়াই ইব্‌ন গালিব আবুল আ'ওয়ার আল-ক্বারশী আল আদুভী।[৩]

তাঁর মাতার নাম ফাতেমা। মাতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হলঃ সাঈদ ইব্‌ন ফাতিমা বিন্‌ত বা'জা ইব্‌ন উমাইয়াহ ইব্‌ন খুওয়াইলিদ ইব্‌ন খালেদ ইবনুল মু'আম্মার ইব্‌ন হাইয়ান ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মুলাইহ।[৪]

তাঁর বংশ পরিক্রমা কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই পর্যন্ত গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এবং নুফাইল ইব্‌ন আব্দুল ওয্যা পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।[৫] তিনি প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবী।[৬] রাসূল (ছাঃ) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে[৭] এবং ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

সাঈদের পিতা যায়েদ সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেই কুফর, শিরক ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে তাওহীদের আলোকবর্তিকা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সেই অন্ধকার যুগেও মুশরিকদের হাতে যবাহকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন না।[৯] এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে হাদীছ এসেছে।-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (ছাঃ) -এর উপর অহি অবতীর্ণ হবার পূর্বে 'বালদাহ' নামক স্থানের নিম্নভাগে যায়েদ বিন আমর এর সাথে মহানবী (ছাঃ) -এর সাক্ষাৎ হয়। তারপর রাসূল (ছাঃ) এর সামনে খাবার আনা হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন এবং যায়েদ এর সামনে ঠেলে দিলেন। অতঃপর যায়েদ বললেন, তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা যবহ কর, তা আমি কিছুতেই খেতে পারিনা। আমি তো কেবলমাত্র তাই খেয়ে থাকি যা যবহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়। যায়েদ বিন আমর কুরাইশদের যবহ সম্পর্কে নিন্দা করতেন এবং উক্ত আচরণের প্রতিবাদ ও তার ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ। তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তিনিই তার জন্য যমীন থেকে ঘাস ও লতা-পাতা উৎপন্ন করেন। এত কিছুর পর তোমরা তাকে গায়রুল্লাহ্‌র নামে যবহ কর?

---

* এম, ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. A.J. Wensinck, the Encyclopaedia of Islam, Vol-6 (London: Luzac and co, 1924), p-66.

২. ইবনুল আছীর, উস্‌দুল গাবাহ, ২য় খণ্ড (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহ, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৩০৬; The Encyclopaedia of Islam, Vol-6, P-66.

৩. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ মুয়াস-সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃঃ ১২৫।

৪. ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০/ ১৪১০) পৃঃ ২৯০।

৫. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১।

৬. ইব্‌ন হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/ ১৪১৫), পৃঃ ৩২৫।

৭. ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র তাঃ বিঃ), পৃঃ ৪৬; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ২৯২।

৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২।

৯. মাওলানা মোহাম্মাদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, আশারা মোবাশ শারা (ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃঃ ২৬১।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ইবনে উমর থেকে (অপর এক সনদে) বর্ণিত, যায়েদ দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্য সিরিয়া থেকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি হয়তো আপনাদের দ্বীন গ্রহণ করতে পারি, সুতরাং আমাকে কিছু বলুন। তখন ইহুদী আলেম বললেন, যদি আল্লাহ্র গযবে পতিত হতে না চাও, তবে আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর। যায়েদ বললেন, আমি সেই ধর্ম হতে পলায়ন করে এসেছি। সুতরাং পুনরায় সে ধর্ম গ্রহণ করব না। অপর কোন ধর্ম সম্পর্কে জানা থাকলে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানিনা, তবে আপনি দ্বীনে হানীফের অনুসারী হতে পারেন। যায়েদ বললেন, দ্বীনে হানীফ কি? সে বলল, ইব্রাহীম (আঃ) আনীত ধর্ম। তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না খৃষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি শুধু সেই ওয়াহদাহু লা শারীকের ইবাদত করতেন।

অতঃপর যায়েদ বেরিয়ে এক খৃষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে সত্য ধর্মের সন্ধান চাইলে তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্র অভিশাপ ঘাড়ে না চাপাতে চাও, তবে আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর। তিনি বললেন, আমি সে ধর্ম হতে পলায়ন করে এসেছি। যায়েদ বললেন, আমাকে কি এমন ধর্মের সন্ধান দিবেন যাতে অভিশাপ নেই। যায়েদ বললেন, তাহলে তুমি দ্বীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, দ্বীনে হানীফ কি? তিনি বললেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর ধর্ম। অতঃপর যায়েদ বেরিয়ে এসে দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর রয়েছি।

লাইছ বলেন, হিশাম তাঁর পিতা ও আসমা বিনতে আবুবকরের বরাত দিয়ে আমাকে লিখেছেন যে, একদিন আমি যায়েদকে দেখলাম যে, তিনি কা'বা ঘরের সাথে স্বীয় পিঠকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, হে কুরাইশ দল, আল্লাহ্র কসম! আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইব্রাহীম (আঃ) -এর দ্বীনের অনুসারী নও। আর ইব্রাহীম (আঃ) জীবন্ত প্রথিত শিশু-কন্যাকে জীবিত করতেন। যখন কেউ তার মেয়েকে হত্যা করতে চাইত, তখন তিনি তাকে বলতেন, একে হত্যা করো না। তোমার পরিবর্তে আমি ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিব। এ বলে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। মেয়েটা যখন বড় হতো, তখন তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি মেয়েটাকে তোমায় দিয়ে দিব। যদি না চাও তবে ভরণ পোষণ করে যাব।[১০]

১০. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড (করাচী: নূর মুহাম্মাদ কারখানা-ই তিজারতিল কতুব, ১৯৩৮/১৩৫৭), 'কিতাবুল মানাকিব' বাবু হাদীছ যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল, পৃঃ ৫৩৯-৫৪০।

অতঃপর যায়েদ (রাঃ) দ্বীনে হানীফের প্রচারক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর মহানবী (ছাঃ) -কে খুঁজে বের করার জন্য দ্রুত পা চালালেন। তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠালেন। কিন্তু যায়েদ তার সাক্ষাৎ পেলেন না। কারণ মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই একদল বেদুইন ডাকাত তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে তিনি রাসূল (ছাঃ) -এর দর্শন থেকে বঞ্চিত হন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ করেন-

اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه إبني سعيداً-

'হে আল্লাহ! যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, তবুও আমার পুত্র সাঈদকে আপনি বঞ্চিত করবেন না'।[১১]

রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলে যারা প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে সাঈদ ছিলেন অন্যতম। তিনি শুধু একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর সহধর্মিণী উমর (রাঃ) -এর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্ত্বাবও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) -এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২] উল্লেখ্য যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রীর কারণেই উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩] ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর উপর নানাবিধ অত্যাচার নেমে আসে। তবুও তাকে ইসলাম থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। বরং তিনি কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-কে ইসলামে দীক্ষিত করেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) ইসলামের জন্য যৌবনের সকল শক্তি ব্যয় করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর অতিক্রম করেনি। হযরত সাঈদ (রাঃ) প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ছিলেন।[১৪] তিনি মুহাজিরদের প্রথম দলের সাথে মদীনায় গমন করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথে উবাই ইবনে কা'ব এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[১৫] ইবনে সা'দ বলেন,

১১. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মা'বুদ, আছহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ৯৭-৯৮।

১২. A. J. Wensinck বলেন, He assumed Islam before Umar's conversion is said to have taken place under the influence of said and his family.
cf: Encyclopaedia of Islam. Vol-6, P-66.

১৩. ইবন আব্দুলি বা'র বলেন,
"كان إسلامه قديما قبل عمر و بسبب زوجته كان إسلام عمر"
দ্রষ্টব্যঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫/১৪১৫). পৃঃ ৩২৫।

১৪। উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৬।

১৫. তদেব।

http://islaminonesite.wordpress.com

মদীনায় পৌঁছে আবু লুবাবার ভাই রেফা'আহ ইবনে সাঈদ (রাঃ) আব্দুল মুনযিরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর রাসূল (ছাঃ) সাঈদ এবং হযরত রা'ফে ইবনে মালিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন।[১৬]

হযরত সাঈদ (রাঃ) বদর যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধেই বীর বিক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১৭] দ্বিতীয় হিজরী সনে কুরাইশদের সেই বিখ্যাত বণিক দল, যে দলটিকে উপলক্ষ্য করেই বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়, সে দলটি শাম দেশ হ'তে আসছিল। সে সময় রাসূল (ছাঃ) হযরত সাঈদ ও তালহাকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁরা শাম সীমান্তে 'তুজবার' নামক স্থানে 'কশদ জোহানীর' মেহমান হন। কুরাইশ বণিক দল সীমান্ত অতিক্রম করলে উভয় গুপ্তচর বণিক দলের দৃষ্টি এড়িয়ে মদীনার দিকে দ্রুত রওয়ানা হন, যাতে রাসূল (ছাঃ) কে বণিকদলের সংবাদ দিতে পারেন। কিন্তু বনিক দল কিছুটা সন্দেহ করে সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে চলতে লাগল। এই বণিকদল এবং তাদের সাহায্যকারী দল যারা মক্কা হ'তে এসেছিল, উভয় দল একত্রিত হয়ে মুসলমানদের সাথে বদর ময়দানে সেই সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যার ফলে সমগ্র জগতে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত হয়।[১৮]

হযরত সাঈদ যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন বদর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসলামের গাযীগণ আনন্দিত মনে রণক্ষেত্র হ'তে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) যেহেতু নিজেও একটি খিদমতে আদিষ্ট ছিলেন, তাই রাসূল (ছাঃ) তাঁকেও বদর যুদ্ধের মালে গণীমতের অংশ দান করে[১৯] এবং জিহাদের ছওয়াব প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ জানান। তিনি ওহোদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধেই রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[২০] ইমাম-যাহাবী বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও তিনি রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে ছিলেন।[২১]

হযরত সাঈদ (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) -এর পরিচালনাধীন পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। দামেশ্ক অবরোধ এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত সাঈদ অংশগ্রহণ করেন।[২২] যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত আবু ওবায়দাহ তাকে দামেশকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।[২৩] কিন্তু জিহাদের প্রেরণায় গভর্ণর পদ হ'তে তিনি বিরক্তিভাব প্রকাশ করে হযরত আবু ওবায়দার কাছে লিখে জানালেন, আপনারা জিহাদ করবেন আর আমি বসে থাকব, আমি তা সহ্য করতে পারব না। যে গভর্ণরের পদ গ্রহণ করে আমার জিহাদকে কোরবানী দিতে হবে, আমার পক্ষে সে পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভবপর নয়। সুতরাং চিঠি হস্তগত হওয়ার পরই আমার স্থলে অন্য একজনকে প্রেরণ করুন। অতি সত্বরই আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করব। হযরত আবু ওবায়দাহ তাঁর জিহাদের প্রেরণা দেখে অবশেষে হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে দামেশকের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন এবং হযরত সাঈদ পুনরায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[২৪]

উমাইয়া যুগে হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে মদীনা বাসীদের মুখে ঘটনাটি শোনা যেত। ঘটনাটি হল, আরওয়া বিন্ত উওনয়াইস নাম্নী এক মহিলা দুর্নাম রটাতে থাকে যে, সাঈদ তাঁর জমির একাংশ জবর দখল করে নিজ জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন।[২৫] যেখানে সেখানে সে এ কথা বলে বেড়াতে লাগল। একপর্যায়ে সে মদীনার ওয়ালী মারওয়ানের নিকট বিষয়টি উত্থাপণ করল। যাচাই করার জন্য মারওয়ান কয়েকজন লোককে তাঁর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) ছাহাবী হযরত সাঈদের জন্য বিষয়টি ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তিনি বললেন, 'তারা মনে করে

১৬. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২; A. J. Wensinck বলেন, Muhammad is said to have taken part said migrated with the Muslims to Medina where Muhammad allied him with Rifa`b. Malik al-Zuraki, or according to others, with Ubaiy b. Ka`b.
c.f: Encyclopaedia of Islam. Vol-6, P-66.

১৭. খতীব আত-তাবরিযী বলেন, "و شهد المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم غير بدر"
দ্রষ্টব্যঃ আল-ইকমাল (দিল্লী: কুতুব খানায়ে রশীদিইয়াহ, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৫৯৬; Fazlul Karim, Al-Hadis of Mishkatul Masabih (Culcutta: Muhammadi press, 1938), P-75.

১৮. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২-২৯৩; সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

১৯. ইবনুল আসীর বলেন, "ولم يشهد بدراً وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه واجره"
দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৬।

২০. ইব্ন সা'দ বলেন, "وشهد سعيد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"
দ্রঃ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; ইব্ন আবদিল বার, আল ইস্তি'য়াব, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাঃ বিঃ), পৃঃ ৪৭।

২১. সিয়ার 'আলাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।

২২. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

২৩. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪-১২৫; Encyclopaedia of Islam, Vol-6, P-66.

২৪. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৬৩।

২৫. তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

আমি তার উপর যুলুম করেছি। কিভাবে আমি যুলুম করতে পারি? আমি তো রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলুম করে নিবে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[২৬] ইয়া আল্লাহ! সে ধারণা করেছে যে, আমি তার উপর যুলুম করেছি, যদি সে মিথ্যুক হয় তবে তার চোখ অন্ধ করে দাও, যে কূপ নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছে এর মধ্যেই তাকে নিক্ষেপ কর[২৭] এবং আমার পক্ষে এমন আলোক প্রকাশ করে দাও, যাতে মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমি তার উপর যুলুম করিনি।[২৮]

এ ঘটনার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হ'ল যে, অতীতে কখনও এরূপ হয়নি। ফলে দু'যমীনের মাঝখানের বিতর্কিত চিহ্নটি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, মুসলিমরা তা দেখে বুঝতে পারল সাঈদ সত্যবাদী। তারপর অল্পদিন যেতে না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একদিন সে তার জমীনে পায়চারী করতে করতে বিতর্কিত জমির কূপটির মধ্যে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।[২৯]

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, 'আমরা শুনতাম লোকেরা কাউকে অভিশাপ দিতে গেলে বলত, আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন অন্ধ করেছেন রওয়া।[৩০] এ ঘটনায় অবাক হওয়ার তেমন কিছুই নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) তো বলেছেন, তোমরা মযলূমের দোআ থেকে দূরে থাক। কারণ সেই দো'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। এই যদি হয় সব মাযলূমের অবস্থা, তাহলে 'আশারা মোবাশশারাহ' বা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন সাঈদ বিন যায়েদের মত মযলূমের দো'আ কবুল হওয়া তেমন আর আশ্চর্য কি?

আবু নু'আইম বিরাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন, মুগীরা একটি বড় মসজিদে বসে ছিলেন। তখন তাঁর ডানে বামে কুফার কিছু লোক বসেছিল। এমন সময় সাঈদ নামক এক ব্যক্তি আসলে মুগীরা তাঁকে সালাম করে খাটের উপর পায়ের দিকে বসালেন। অতঃপর কুফাবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে মুগীরার দিকে মুখ করে গালি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুগীরা এ লোকটি কার প্রতি গালি বর্ষণ করছে? তিনি বললেন, আলী বিন আবী তালিবের প্রতি। তিনি বললেন, ওহে মুগীরা! এভাবে তিনবার ডাকলেন। তারপর বললেন, রাসূল (ছাঃ) -এর ছাহাবীদের এভাবে গালি দেওয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ আমি দেখতে চাইনা।[৩১] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আব্দুর রহমান জান্নাতী, সা'দ জান্নাতী এবং নবম এক ব্যক্তিও জান্নাতী, তোমরা চাইলে আমি তার নামটি বলতে পারি। রাবী বলেন, লোকেরা সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূলুল্লাহ্‌র ছাহাবী, নবম ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, নবম ব্যক্তিটি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন, যে ব্যক্তি একটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁর সাথে তার মুখমণ্ডল ধুলি ধুসরিত হয়েছে, তার এই একটি কাজ যে কোন ব্যক্তির জীবনের সকল সৎ কর্ম অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে নূহের সমান বয়স লাভ করুক না কেন।[৩২]

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকেও বহু ছাহাবী ও তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে ইবনে হিশাম, ইবনে উমর, আমর বিন হুরাইস, আবু তুফাইল, কায়েস বিন হাযেম, আবু উছমান আন-নাহদী, হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আব্দুর রহমান ইবনে আমর ইবনে সাহ্‌ল, উরওয়া বিন যুবাইর, আব্দুর রহমান ইব্‌নুল আখনাস, আব্বাস বিন সাহ্‌ল বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ বিন আউফ, মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, মুহাম্মাদ বিন সীরীন[৩৩]

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) মদীনার নিকটবর্তী আকীক নামক উপত্যকায় ইন্তেকাল করেন।[৩৪] তাঁর মৃত্যুকাল

২৬. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৭; সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।
২৭. তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫।
২৮. আশারা মোবাশ্‌শারা, পৃঃ ২৬৩; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।
২৯. আল-ইদাবাহ, ঐ; তাহযীব, ঐ;
A. J. Wensinck বলেন, She became blind and was drowned in a well in to which she happened to fall becouse of her blindness.
c.f: Encyclopaedia of Islam, v-6, p-66.
৩০. উসদুল গাবাহ, ২ঘ খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।
৩১. মুহাম্মাদ ইউসুফ আলকান্দুলুভী, হায়াতুছ ছাহাবাহ, ২য় খণ্ড (দামেশ্‌ক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩/১৪০৩), পৃঃ ৪৭০।
৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭০।
৩৩. তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫।
৩৪. Encyclopaedia of Islam, vol-6, p-67.

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ওয়াকেদীর মতে ৫০ অথবা ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসরের বেশী।[৩৫] উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ আয্-যুহরীর মতে তিনি ৫২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৩৬] ইবনে উমর (রাঃ) যখন জুম'আর ছালাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সে সময় সাঈদ (রাঃ) -এর ইন্তেকালের সংবাদ পান। সংবাদ পেয়েই জুম'আর ছালাত বাদ দিয়ে আকীকে গমন করেন। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস তাঁকে গোসল করান। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তার ছালাতে জানাযার ইমামতি করেন। অতঃপর মদীনায় এনে তাকে দাফন করা হয়।[৩৭] কুফাবাসীদের মতে তিনি মু'আবিয়ার খেলাফত কালে কুফাতেই ইন্তেকাল করেন[৩৮] এবং মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) তাঁর ছালাতে জানাযার ইমামতি করেন।[৩৯]

উপসংহারঃ

ইসলামের আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিকে সারা বিশ্বে বিস্তারের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ছাহাবীদের অবদান অপরিসীম। তেমনি হযরত সাঈদ (রাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত বিধানকে যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বীয় জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবন চরিত থেকে আমাদের বহু কিছু শিখার আছে। আমাদের উচিৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের আদর্শকে বাস্তবায়ন করা।

৩৫. সিয়ারে, আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০; তাহযীব আত-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৬; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

৩৬. ইব্ন সা'দ বলেন, توفى سعيد بالعقيق فحمد على رقاب الرجال فدفن بالمدينة ونزل فى حفرته سعد وابن عمرو ذالك سنة خمس او احدى وخمس وكان يوم مات ابن ويضع وسبعين سنة-

দ্রঃ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৩৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৩৮. A. J. Wensinck বলেন, According to others he dicd as govarnor of al-Kufa under the Muawiya.

c.f: Encyclopaedia of Islam, vol-6, p-67.

৩৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪-২৯৫।

গল্প

কাঁচির ফাঁদে মৃত্যু

*-মতীউর রহমান**

পলাশের ঘুম থেকে উঠতে আজ একটু দেরিই হলো। সারা রাত দাঁড়িয়ে ছিল বাবার শিয়রে। একটুও ঘুম হয়নি। গতকাল ডাক্তার এসে বলেছে, বাবার একটি জটিল রোগ দেখা দিয়েছে। ক্লাশ ফাইভের ছাত্র পলাশ। প্রতিদিনের মত আজও পড়তে বসল। কিন্তু পড়ার টেবিলে মন বসছে না। শুধু মনে পড়ছে অসুস্থ বাবার যন্ত্রণাকাতর চেহারাটা। পৃথিবীতে বাবা-ই তার একমাত্র আপন জন। মা মারা গেছে জন্মের পর পরই। দশটি বছর ধরে বাবা তাকে বড় করেছে মায়ের আদর দিয়ে। একটু পরেই কড়া নকের শব্দ পেল- খট্ খট্ খট্। পাশের বাড়ীর রহমত চাচা এসেছে। পলাশ তার বাবার ঘরে নিয়ে গেল। রহমত আলী একমাত্র ব্যক্তি যে নিয়মিত পলাশের বাবাকে দেখতে আসে। পলাশের বাবা রহমত আলীকে দেখে পাস ফিরে শোয়ে। ক্ষীণ স্বরে বলল, রহমত এসেছো? –হ্যাঁ এরফান ভাই, কেবলি আসলাম।

- ডাক্তার কি বলল?

-ডাক্তার বলেছে, আজই ঢাকা যেতে হবে। এখানে থেকে কোন উন্নতি হচ্ছে না।

- যা ভাল হয় তাই কর। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। পলাশ বলল, আজকেই যাবেন চাচা?

-হ্যাঁ বাবা, হাতে মোটেই সময় নেই। বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নাও। সকাল দশটায় ট্রেন। রহমত আলী তার বাড়ীতে গেল। বাবার পাশে এসে বসল পলাশ। এরফান আলী হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সন্তানের গায়ে। পলাশ বাবার মাথায় হাত রাখল। আলতো করে টেনে দিচ্ছে মাথার চুল। হঠাৎ লক্ষ্য করে, বাবার চোখে জল। পলাশ হাত দিয়ে মুছে দেয়। এক সময় পলাশেরও কাঁন্না পায়। এরফান আলী ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'কাঁদিসনে বাবা। শিগ্‌গীর ভাল হয়ে উঠব।

ঢাকাতে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে। সেখানে গেলেই আমি সেরে উঠব। ধীরে ধীরে শান্ত হয় পলাশ। মনের মাঝে আস্থা ফিরে পায়। ঢাকা গেলেই বাবা সুস্থ হয়ে উঠবে। এবার সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। এমন সময় বাবার চিৎকার শুনে ছুটে এলো। পেটের ব্যথাটা আরও বেড়ে গেছে। দীর্ঘক্ষণ ম্যাসেজ করল।

* হেতেম খাঁ, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

একটা ট্যাবলেট ও খাওয়ালো। ব্যথা উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। দেয়াল ঘড়িতে নয়টা বাজার শব্দ হলো। বাবার অসহ্য ব্যথাটা ঘড়ির কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছে তার বুকের ভিতর। এ যেন মোটেই ভাল হবার নয়। এমন সময় রহমত আলী পাশে এসে দাঁড়াল কি খবর পলাশ আবার কি হলো। পলাশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, বাবার অবস্থা ভাল না চাচা, ব্যথাটা আবার বেড়েছে। রহমত লক্ষ্য করল- সতিই এরফান আলী প্রচণ্ড ব্যথায় কোঁকাচ্ছে। এদিকে ট্রেনের সময়ও প্রায় হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর ব্যথাটা সামান্য কমতে থাকে। সবাই মিলে মিশুকে উঠল। ষ্টেশনে যখন পৌঁছল, তখন দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট । ট্রেনে উঠে এরফান আলী সামান্য হাঁপাতে লাগল। ধীরে ধীরে ট্রেনের চাকা গুলো নড়ে উঠল। দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পেরিয়ে এলো মাঠের মধ্যে।

পলাশের পুরনো দিনের স্মৃতি গুলো মনের আয়নায় ভেসে উঠল। গত বছর পরীক্ষা শেষে বাবার সাথে------বেড়াতে গিয়েছিল। কতনা আনন্দ হয়েছিল সেদিন। বাবার পাশে বসে জানালার দৃশ্য গুলো দেখছিল, চোখ মুছে বাবার পাশে গিয়ে বসল। এক সময় চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। চাচার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে পলাশ। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ কমলাপুর রেল ষ্টেশনে পৌঁছল। রহমত আলী তার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করল। পরদিন সকালে চিকিৎসা শুরু হলো ক্লিনিকে। পলাশ সব সময় বাবার পাশেই বসে আছে। এরফান আলী বেডে শোয়ে আছে। রহমতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই রহমত জানি না কি হবে। পলাশকে তুই দেখে রাখিস। ওর যে কেউ আর রইল না '। রহমত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ভেবনা এরফান ভাই। কিছুই হবেনা। অপারেশনটা ভালমত হোক; সব ঠিক হয়ে যাবে। এরফান আলী আবার সন্তানকে জড়িয়ে ধরল।

বিকেল পাঁচটায় এরফান আলীকে নিয়ে গেল অপারেশন থিয়েটারে। বাবার জন্য উঁচু স্বরে কাঁদতে লাগল পলাশ। রহমত পলাশকে ছাদের উপর নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানেও তার মন বসছে না।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে জানালো অপারেশন সন্তোষজনক হয়েছে। রহমত আলী হাত তুলে মোনাজাত করল। কয়েক ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরল এরফান আলীর। ডাক্তারের নিষেধ থাকায় কথা বলতে পারলনা কেউ। ধীরে ধীরে এরফান আলী সুস্থ হয়ে উঠে।

নাস্তার টেবিলে রহমত বলল, ডাক্তার বলেছে কিছুদিন ঢাকায় থাকতে। সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তখন বাড়ী যাওয়া যাবে। এরফান আলী বলল, এতোদিন তোমার আত্মীয়ের বাসায় থাকব? সে নিয়ে ভাবতে হবেনা তোমাকে। আমার চাচাতো ভাই খুব ভাল মানুষ। তোমরা বস আমি ওষুধটা নিয়ে আসি।

বিকেল হতেই এরফান আলীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অনেক দিন পর ভাল একটা ঘুম হলো। চেয়ে দেখে পাশে বসে আছে পলাশ। সন্তানকে কাছে টেনে আদর করতে লাগল। এমন সময় রহমতও ঘরে এলো। বসতে বসতে বলল, কেমন আছেন এরফান ভাই? আছি ভাল, তবে পলাশের মনটা ভাল লাগছে না। কয়েকদিন রাত জেগে ওর শরীরটাও একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ওকে ঢাকা শহরটা একটু দেখিয়ে নিয়ে এসো ভাই। এরফান আলী একটু থেমে আবার বলল, তাছাড়া সব ঝামেলাতো তোমার উপর দিয়েই যাচ্ছে। রহমত বলল, না এরফান ভাই, ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দিবেন না। তেমন কিছুই করিনি। শুধুমাত্র সহযোগিতা করেছি মাত্র।

রহমত পলাশকে নিয়ে প্রথমে শিশু পার্কে গেল। নানা রঙের পোষাক পরে ছেলে-মেয়েরা লাফা লাফি করছে। দেখতে খুব ভাল লাগছে পলাশের। এর আগে পলাশ জেলা শহরের শিশু পার্ক দেখেছে। ঢাকা শহরে এই প্রথম। সব কিছুই যেন ধাঁ-ধাঁর মত লাগছে। পৃথিবীতে এমন জগৎ আছে এটা তার ধারণায় ছিলনা। 'নাগর দোলায়' ওঠার সময় সামান্য ভয় হয়েছিল পলাশের রহমত চাচা পাশে থাকায় তেমন কিছু হয়নি। বের হয়ে এলো পার্ক থেকে। রহমতের আঙ্গুল ধরে পলাশ বলল, আচ্ছা চাচ্চু এটা কি শিশু পার্ক? যদি শিশুপার্ক হয় তাহলে বড় বড় মানুষগুলো আসে কেন?

-কেন বুঝলে না? আমি যেমন তোমার সাথে এসেছি। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল পলাশের। একা একা ভাবতে লাগল। অনেক মা-ই শিশুদের সাথে এসেছে। আবার কারও বাবাও এসেছে। পলাশও তাদের মত শিশু। কিন্তু ওর মা ছোট থেকেই নেই। বাবা আছে বিছানায় শুয়ে। বাবা ভাল থাকলে হয়ত হাত ধরে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতো।

রহমত বলল, এবার চিড়িয়াখানা যাবে? চাচার কথায় সচকিত হয় পলাশ। স্বাভাবিক হয়ে--- উত্তর দিল, আজকে আর ভাল লাগছেনা চাচা। বাবার জন্য খুব খারাপ লাগছে। ঠিক আছে বাসায় চলো। রহমত আলী একটি মিশুক ডাকল। দু'জন পাশাপাশি বসল। ১১৯ লুৎফর রহমান লেন-এ এসে থামল। ঘরে ঢুকতেই রহমত আলীর বুকটা ধক্ করে কেঁপে উঠে।এরফান আলী শুধু কোঁকাচ্ছে। পলাশ বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রহমত কয়েকবার জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে। কোন উত্তর পেল না। এরফান আলী শুধু ছট্‌পট্ করছে। পলাশ হাঁও মাঁও করে কাঁদতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পর এরফান আলী ক্ষীণ স্বরে বলল, পূর্বের চেয়েও

http://islaminonesite.wordpress.com

বেশী ব্যথা করছে। রহমত ভেবে পাচ্ছেনা কেন এমন ইনফেক্শন হলো। তাড়াতাড়ী ক্লিনিকে নিয়ে গেল। ডাক্তার সব রকম পরীক্ষা করে দেখল। ব্যথার কোন উপসর্গ খুঁজে পেলনা। ক্রমান্বয়ে ব্যথা বেড়েই চলেছে। চোখ দু'টি অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে। অবস্থার উন্নতি না দেখে সব ডাক্তার একত্রে বসল। সিনিয়র ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আল্ট্রাসনোগ্রাফ করা হলো। রিপোর্ট দেখা গেল, পেটের মধ্যে নতুন কিছু একটা ভেসে আছে। দ্বিতীয় বারের মত অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো।

পুনরায় অপারেশন করে যে জিনিসটা পাওয়া গেল, এতে ডাক্তার নিজেই অবাক! একি? এতো আপারেশন করা কাঁচি! ডাক্তার ভেবে পাচ্ছে না কাঁচি কোত্থেকে এলো। সাহায্যরত নার্স বলল, প্রথম বার আলতাফ স্যার অপারেশন করলেন, তারপর থেকে এই কাঁচিটা আমরা অনেক খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি।

কর্তব্যরত ডাক্তার নার্সের কথা শুনে আরও অবাক হ'লেন। এ কেমন করে সম্ভব? কাঁচি রেখেই ডাক্তার সেলাই করলেন?

খুব তাড়াতাড়ি অপারেশনের কাজ শেষ হলো। ডাক্তার অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে, এই বুঝি জ্ঞান ফিরছে। কিন্তু এরফান আলীর জ্ঞান আর কোন দিনই ফিরল না। হৃদয় স্পন্দন বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে॥

ছোট্ট শিশু পলাশ। শুয়ে থাকা লাশের উপর কান্নায় আছড়ে পড়ল। বাক শক্তিহীন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রহমত আলী।

[বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতের বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে এটাই। রোগীর জীবন এখানে অনেকটা গৌণ। পয়সাই মুখ্য। অথচ রোগীর সরল বিশ্বাসে ডাক্তারের ছুরি-কাঁচির নীচে তাদের দেহকে সঁপে দেয় নির্বিবাদে। রোগীর আত্মীয়রাও বণ্ড লিখে দেয় অবিমিশ্র বিশ্বাসে। কিন্তু ডাক্তাররা সেই সরলতা ও সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন কি? ডাক্তাররা এখন রীতিমত লুটেরা ডাকাতে পরিণত হয়েছেন। অথচ জনগণের পয়সায় গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী নিয়েই তারা ডাক্তার হয়েছেন। একবারও ভেবেছেন কি যে তাদেরকেও একদিন মরতে হবে? -সম্পাদক]

হাদীছের গল্প

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম*

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে যাকাতুল ফিৎরের উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। অধিক রাত্রী জাগরণের ফলে আমার চোখে তন্দ্রা আসে। এ সুযোগে এক ব্যক্তি এসে ঐ মাল হ'তে কিছু উঠিয়ে নিয়ে তার চাদরে জমা করতে থাকে। তখন আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম, 'তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকট বিচারের জন্য পাঠাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত অভাবী, বাল বাচ্চা নিয়ে খুব কষ্টে আছি। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি তার অনুরোধের কারণে ছেড়ে দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার রাতের বন্দী কি করেছিল'? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করলে ও সন্তানের দোহাই দিলে তার প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হয়, কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সাবধান থেকো, সে আবার আসবে'। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর কথা মত সজাগ দৃষ্টি রেখে পাহারা দিতে থাকলাম। হঠাৎ দেখি সে এসে আবার মুঠি ভরে খাদ্য উঠাতে আরম্ভ করেছে। আমি তাকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর কাছে নিয়ে যেতে চাইলাম। সে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দিন; আমি খুবই দরিদ্র, ছেলে মেয়ে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে আছি, তারা আমার অপেক্ষায় আছে। আমি আর আসব না। তার কথায় আমার দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে আবু হুরায়রাহ (রাঃ)! তোমার রাতের বন্দীটি কি করেছে'? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে অত্যন্ত অভাবের অভিযোগ করল, ক্ষুধার্ত ছেলে মেয়ের কথা জানাল। তার প্রতি করুণা করে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, হুঁশিয়ার থেকো, সে আবার আসবে' ফলে আমি তৃতীয় রাতে পাহারা আরো জোরদার করলাম।

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, গাংনী কলেজ, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

দেখলাম সে তার ঠিক সময়ে আবার এসে মুঠি ভরে খাদ্য নেওয়া শুরু করেছে। আমি তখন তাকে ধরে ফেলে বললাম, এটাই তৃতীয় বার এবং এটাই শেষ। তুমি বার বার বলছ যে, আর আসবে না অথচ আবার আসছ। সুতরাং আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবই। সে বলল 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কতগুলো কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনার উপকার সাধন

করবেন। আমি জানতে চাইলে সে উত্তর দিল 'বিছানায় শয়নকালে আপনি আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন (সূরা বাক্বারাহ্র ২৫৫ আয়াত)। তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আপনার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান আর আপনার নিকটবর্তী হবে না'। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি এর বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা ভাল কাজের প্রত্যাশী ছিলেন।

প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'গত রাতে তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম, 'সে আমাকে কিছু কালেমা শিক্ষা দিয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে কল্যাণ করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি'। রাসূল (ছাঃ) বললেন,যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী তথাপিও এব্যাপারে সত্য বলেছে। হে আবু হুরায়রাহ! গত তিন রাত ধরে যার সাথে কথা বললে তাকে কি তুমি চেন? আমি বললাম না। তিনি বললেন, সে হ'ল শয়তান।

-বুখারী, মিশ্কাত, আলবাণী, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়; হাদীছ সংখ্যা ২১২৩।

কবিতা

আইয়্যামে জাহেলিয়াত

-আব্দুল আউয়াল
পরিসংখ্যান (শেষ বর্ষ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সে সময়-
মরুর বাতাসে ঘ্রাণ ছিল না, ছিল দুর্গন্ধ।
চারিদিকে মযলূমের হাহাকার,
মানুষের পিপাসা মানুষের রক্তে মেটে।

সে সময়-
সমাজ সংস্কৃতিতে মদ আর জুয়া,
ভালবাসার স্থায়ী আসনে লাত, মানাত আর ওজ্জা॥

আজ-
চোখ মেলে অনেক কিছুই দেখা যায় না,
চোখ বুজলেই ধূর্ত শিকারীর বন্দুকের নল দেখা যায়।
বালিতে লাশ নেই,
ডাষ্টবিনের পলিথিনে কিংবা ছ্যাড়া ন্যাকড়ায় শিশু বাচ্চার অপূর্ণ দেহ।

আজ-
মানুষের চোখে হায়েনার দৃষ্টি,
বাঘেরা মানুষ দেখলে ভয়ে বিড়াল সাজে।
নারী দেহ আজ সর্বোত্তম খাবার
মানুষের দেহ নর্দমার কীটে বাসা বাঁধে।

আজ-
পথের ধূলায় বারুদের ঝাঁক,
চারিদিকে জঙ্গী বিমান-এটম বোমার জয় জয়কার।
রঙিন পানিতে এইড্সের জীবাণু,
মানুষ তাই পান করে, মহা উল্লাসে।

মহা বৈজ্ঞানিক

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা,
ডিনামাইট তৈরী করেছি
আমরা তাজমহল গেঁথেছি।
আমরা ব্যাবিলনের স্বর্গোদ্যান, মস্কোর ঘন্টা-
সাইপ্রাসের পেতন মূর্তি করেছি।
আমরা টেমস নদীর তলদেশে সুড়ঙ্গ তৈরী করে
যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছি।

http://islaminonesite.wordpress.com

কিন্তু পারিনি সামান্য একটা শস্যকণা সৃষ্টি করতে,
পারিনি ছোট্ট একটা জীব সৃষ্টি করে প্রাণ দিতে।
আমরা পারিনি নগন্য জীব পিপীলিকার মত
একটা প্রাণী সৃষ্টি করতে,
পরিনি একই উপাদান থেকে ঝাল, লবণ,
টক, মিষ্টি তৈরী করতে।
আমরা পারি কাগজ ও প্লাষ্টিক দিয়ে ফুল তৈরী করতে,
কিন্তু পারিনা ফুলে সুঘ্রাণ দিতে।
আমরা পারি মাটি বা পাথর মূর্তি বানাতে
কিন্তু পারিনা তাতে রূহ দিতে।
কিন্তুঃ তিনি কে?
যিনি সৃষ্টি করলেন জিন-ইনসান থেকে শুরু করে
পিপীলিকার মত অসংখ্য প্রাণী,
যিনি আহার যোগান সমুদয় সৃষ্টির।
যিনি মৃত যমীনকে বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করে
সৃষ্টির জীবিকার ব্যবস্থা করেন।
তিনিই সেই মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহ।

পরিত্রাণ

-এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তারকা!
মুক্তির আশায় আমি পূজা করি তোমায়।
পরিত্রাণদানের ক্ষমতা নেই তোমার
আচরণে দেখালে আমায়।
চাঁদমামা!
তুমি কি পারবে আমার আশা পূরণ করতে?
তাহলে তুমি কোথায় হারিয়ে যাও অমাবস্যা রাতে।
ভানুও পারবেনা বলে পলায়ন করলো পশ্চিম দিগন্তে।
তাহলে উপায় কি?
আমার মুক্তি কি হবে না মরণান্তে?
পেয়েছি নতুন পথ, প্রতিমা গড়েছি নিজ হাত্।
মুক্তির আশায় পূজা করি তোমায় সারা দিনরাত।
খাও, কথা বল, কে করিলো তোমার এই দূর্গতি?
তোমার কি কোন ক্ষমতা নেই, সত্য কি তবে
ইব্রাহিমী নীতি?
মুক্তির আশায় সদা দরগায় লুটাই মাথা।
পরিত্রাণ দেবে আমায় পীর বাবা
বলেছেন আল্লাহ তা'আলা কোন ক্ষমতা রাখেনা তারা।
পরিত্রাণের পথ আমি বর্ণনা করেছি এ ধরায়।

অবশেষে বললেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)
শোন হে আশরাফুল মাখলুকাত,
মুক্তির একই পথ (তা হলো) দাওয়াত ও জিহাদ॥

জাগো মুজাহিদ

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
দুর্বাডাঙ্গা,মনিরামপুর, যশোর

হে মুজাহিদ! বীর খালিদের দল
কেন যাও নিদ্রা এখন লুকিয়ে অসীম বল?
যুগ যুগ ধরে কেন রয়েছো অচেতন ঘুমিয়ে
অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত তবু রয়েছো ঝিমিয়ে।
হে মুজাহিদ দল! দেখ একবার জেগে
শয়তানের দল আসছে ছুটে প্রবল বেগে।
নাঙ্গা অস্ত্রে চায় যে তারা ধ্বংসিতে এই দ্বীন
আমৃত্যু তারা করিছে চেষ্টা করিতে তোমারে হীন।
হে মুজাহিদ! চেয়ে দেখ ঐ জার এর রাশিয়া
ইয়াজুজ সন্তান ওরা চায় হ'তে দুনিয়ার বাদশা।
এটম, হাইড্রোজেন বোমায় নিশ্চিহ্ন করতে চায় মুসলমানদের
প্রগতির জৌলুসে ওরা তুলে দিতে চায় মর্যাদা ইসলামের।
হে মুজাহিদ! চেয়ে দেখ ঐ ফিলিস্তিন-কাশ্মীর ,
সবুজ যমীনে বইছে স্রোত মুসলিম খূনের।
কত মুমিন মরিছে অকারণ, কত মা-বোনের সম্ভ্রম,
লুটিতেছে ইবলিস বাহিনী করে নিমন্ত্রণ।
হে মুজাহিদ! নয়ন মেলি দেখ ঐ চেচেন-
বসনিয়া, গাজা ও আজারবাইজান;
নিপিড়ীত, নির্যাতিত কসোভো মুসলিম,
যালেমের কৃপাণাঘাতে কাঁদে মানবতা প্রেম।
হে মুজাহিদ! দেখ, বেহায়া বেশ্যা তসলীমা নাছরীন
আল্লাহ-রাসূলের শিক্ষাকে সে করতে চায় বিলীন।
ক্লিনটন আর ইহুদীদের কোলে বসে হাসছে ক্রুর হাসি,
ভেংচি কেটে মুসলমানদের দিচ্ছে গলায় ফাঁসি।
সমাজ আজি হয়েছে যেন নরক বাস,
ভিসিআর আর ডিশ এন্টেনা করছে সর্বনাশ।
হেন কালে হে মুজাহিদ! থেকনা আর ঘুমিয়ে,
জাগো তুমি সুপ্ত হৃদয়ের অসীম সাহস নিয়ে।
জাগো মুজাহিদ দ্বীপ্ত ঈমানী তেজ নিয়ে,
এ ধরাকে দাও ভরিয়ে ভালবাসা দিয়ে।

***

বেদনা

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
পশ্চিম চত্তর টিন শেড কোয়াটার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

এতদিন আমি ছিলাম বন্ধু তোমাদের কাছে ভাল
হঠাৎ করে তোমাদের ভাষায় বুঝতে পারলাম
'উই হেট ইউ'।
গবেষণা করে জানতে পারলাম

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মিষ্ট ভাষী মহা পণ্ডিত বন্ধু পেয়েছো নাকি?
সমাজে থাকে অনেক মানুষ, ভাল-মন্দ মিলে,
ইবলিস ভাবে তাদেরকে আমি ভ্রষ্ট করব কিভাবে।
দেয় সে তখন নানা প্রলোভন মানুষের মনে মনে,
হোঁচট খেয়ে পড়ে অনেকে ইবলিসের প্রলোভনে।
ভাল মানুষ বেরিয়ে আসে সত্য সরল পথে
মিষ্ট ভাষী দুষ্ট মানুষ বের হয় মহা ইবলিস হয়ে।
বন্ধুরা সব ভুলে যেয়োনা
স্মরণ রেখ একটি কথা-
মহা ইবলিস মিষ্টি কথা বলে সর্বদা।
***

ইসলামী শিক্ষা সংগীত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

পড় ভাই পড়
কুরআন হাদীছ পড়,
সুস্থ সুন্দর জীবন গড়তে
জ্ঞানের কলস ভরো।
লেখাপড়া করলে শুধু যায় না মানুষ হওয়া
অহি-র জ্ঞানে গুণী হও এটাই মোদের চাওয়া!
বিশ্ব সেরা মানুষ হ'তে নবীর সেরা পথ ধর,
পড় ভাই পড় কুরআন-হাদীছ পড়।
সকল পাপের কুপথ ছেড়ে জ্ঞানের পথ ধর,
পড় ভাই পড়, কুরআন-হাদীছ পড়।
ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজ, গণিত সবই পড়া যাবে
ধর্মীয় জ্ঞান এদের সাথে থাকতে হবে তবে,
নইলে তোমার পথ চলা ভাই
হবে কঠিনতর, হবে কঠিনতর,
পড় ভাই পড় কুরআন-হাদীছ পড়।
***

সংস্কার

-ডাঃ মুহাম্মাদ বানী আমীন বিশ্বাস
কুলবাড়ীয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

মুসলিম ভাই আসুন গড়ি হকের সমাজ
আসুন অহংকার ছেড়ে পড়ি ছহীহ নামাজ।
যে মুসলমানকে দেখে বিধর্মীও এসেছে ধর্মে
আজ দেখুন উল্টে যাচ্ছে নিজের বিজাতীয় কর্মে।
মুসলিম সে নির্ভিক, জয় করেছে দিক-বিদিক
হক্বের সঙ্গে বাতিল মিশিয়ে সব আজ বেঠিক।
প্রয়োজন এখন ঈমানী শক্তি আর যোগ্য নেতা
তবু আমরা মেতে আছি নিয়ে বিজাতীয় বারতা।
বাতিল ছেড়ে আসুন ছহীহ হাদীছ আর কুরআনে,
ছহীহ হাদীছ মান্‌ব তাতে বাঁধবে কেন সম্মানে?
ধরায় আছে যখন আল-কুরআনের বাণী
বৃথা কেন এজমা ক্বিয়াস ফিকাহ শাস্ত্র টানি?
বাতিল ছেড়ে হকের পথে মিলাই আসুন হাত
রাসূলের উম্মাত হিসাবে পাই যেন শাফা'আত।
***

প্রার্থনা

-আশরাফুল ইসলাম
দোগাছী, নাটোর।

মুছে দাও প্রভু মোর হৃদয়ের জল
বৃদ্ধি কর প্রভু মোর ঈমানের বল।
মোর বেঈমানী দূর কর প্রভু তুমি
তোমার ফযলে ঈমান্দার হই যেন আমি।
ছালাত যেন কভু আমি ত্যাগ না করি
পূর্ণ মুমিন হয়ে প্রভু আমি যেন মরি।
সৎপথে যেন আমি সর্বদাই চলি
কঠিন বিপদেও যেন সত্য কথা বলি।
বেয়াদবী করিনা যেন মা বাবার সনে
মা-বাবা যে গুরু মোর, থাকে যেন মোর মনে।
ওস্তাদের সাথে যেন বেয়াদবী নাহি জুড়ি
পড়শীর সাথে যেন কভু ঝগড়া না করি।
তোমার ও রাসূলের হক্ব প্রভু আদায় যেন করি
সর্বদা গুরুজনের সম্মান যেন করি।
মিথ্যা কথা ও বাজে কাজ করিনা যেন কভু
মিনতির সুরে এই প্রার্থনা করি হে প্রভু।
***

আলো

-মুযযাম্মিল হক
এম, বি, এস, (ফাইন্যাল)
মৌপাড়া, ধোপাঘাটা, রাজশাহী

তোমরা যখন পড় নাটক আর উপন্যাস
আমরা তখন পড়ি হাদীছ ও কুরআন।
আমরা যখন দেখি ভালো আর মন্দ
তোমরা তখন খুজোঁ মাও, লেলিন আর এঙ্গেল্‌স।
তোমরা যখন পড় 'অপরাধ জগৎ'
আমরা তখন পড়ি 'আত-তাহরীক'।
তোমাদের লক্ষ অন্ধকার পঁচা গলীতে
আমাদের লক্ষ্য হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে।
অহি-র দাওয়াত নিয়ে ঐ আসছে
ফির্কাবন্দী তাই অস্ফুট স্বরে কাঁদছে।
টালমাটাল সব ঝগড়াটে হিংশুক ও জঘন্য
আত-তাহরীক তুমি ধন্য অনন্য।
***

http://islaminonesite.wordpress.com

মহিলাদের পাতা

নবীজীবনের স্মরণীয় তারিখ সমূহ

-সংগ্রহেঃ তাহেরুন নেসা

১. জন্মঃ	সোমবার (ছুবহে ছাদিকের পরে, সূর্যোদয়ের পূর্বে)	৯ই রবীউল আউয়াল ১৯ শে এপ্রিল (জুলিয়ান ক্যালেঃ) [ইয়ামনের শাসক আবরাহা কর্তৃক কা'বা অভিযানের ৫২দিন পরে]	১ম হস্তীবর্ষ * ৫৭১ খৃষ্টাব্দ
২. নবুঅত লাভঃ	সোমবার	৯ই রবীউল আউয়াল ৯ই ফেব্রুয়ারী	৪১ হস্তীবর্ষ ৬১০ খৃষ্টাব্দ
৩. অহি-র আগমন শুরুঃ	বুধবার	২১শে রমাযান ১০ই আগস্ট	৪১ হস্তীবর্ষ ১ম নববীবর্ষ ৬১০ খৃষ্টাব্দ
৪. ছাহাবীদের আবিসিনিয়া হিজরতঃ		.....রজব .....এপ্রিল	৪৫ হস্তীবর্ষ ৫ম নববীবর্ষ ৬১৪ খৃষ্টাব্দ
৫. শে'বে আবী ত্বালিব উপত্যকায় তিন বছরের আটকদশা শুরুঃ	মঙ্গলবার	১ লা মুহাররম ৩০শে সেপ্টেম্বর	৪৭ হস্তীবর্ষ ৭ম নববীবর্ষ ৬১৫ খৃষ্টাব্দ
৬. মি'রাজঃ **	.....	..... ১৯শে মার্চ	৫০ হস্তীবর্ষ ১০ম নববীবর্ষ ৬১৯ খৃষ্টাব্দ
৭. আক্বাবায়ে উলা (হজ্জের মওসুমে মক্কায় ১২জন ইয়াছরিব বাসীর বায়'আত গ্রহণ ও মুছ'আবকে ইয়াছরিবে প্রেরণ। আগের বছর ..... ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬জনের ইসলাম গ্রহণ)ঃ		.... যুলহিজ্জা	১২ নববীবর্ষ ৬২১ খৃষ্টাব্দ
৮. আক্বাবায়ে ছানিয়া (হজ্জের মওসুমে মক্কায় ..... ৭৫ জন ইয়াছরিব বাসীর বায়'আত গ্রহণ)ঃ		.... যুলহিজ্জা	১৩ নববীবর্ষ ৬২২ খৃষ্টাব্দ
৯. মক্কার বাইরে ছওর গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণঃ	বৃহস্পতিবার (দিবাগত রাতে)	২৭শে ছফর ১৩ই সেপ্টেম্বর	১৪ নববীবর্ষ ৬২২ খৃষ্টাব্দ
১০. ছওর গিরিগুহা হ'তে হিজরত শুরুঃ	সোমবার	১লা রবীউল আউয়াল ১৬ই সেপ্টেম্বর	১৪ নববীবর্ষ ১ম হিজরীসন ৬২২ খৃষ্টাব্দ

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

১১. ক্বোবা উপস্থিতিঃ	সোমবার	৮ই রবীউল আউয়াল ২৪শে সেপ্টেম্বর	৫৪ হস্তীবর্ষ ১৪ নববীবর্ষ ৬২২ খৃষ্টাব্দ
১২. ইসলামের ১ম জুম'আঃ	শুক্রবার	১২ই রবীউল আউয়াল ২৪শে সেপ্টেম্বর	১৪ নববীবর্ষ ১ম হিজরীসন ৬২২ খৃষ্টাব্দ
১৩. মদীনায় প্রবেশঃ	শুক্রবার	১২ই রবীউল আউয়াল ২৪শে সেপ্টেম্বর	১৪ নববীবর্ষ ১ম হিজরীসন ৬২২ খৃষ্টাব্দ
১৪. মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপনঃ	.....	.....	১৪ নববীবর্ষ ১ম হিজরীসন ৬২২ খৃষ্টাব্দ
১৫. ক্বিবলা পরিবর্তন (জেরুজালেম হ'তে কা'বা)ঃ	শনিবার	১৫ই শা'বান ১১ই ফেব্রুয়ারী	১৫ নববীবর্ষ ২য় হিজরীসন ৬২৪ খৃষ্টাব্দ
১৬. ছিয়াম ফরয হ'লঃ	রবিবার	১লা রমাযান ২৬ শে ফেব্রুয়ারী	১৫ নববীবর্ষ ২য় হিজরীসন ৬২৪ খৃষ্টাব্দ
১৭. যাকাত অতঃপর জিহাদ ফরয হ'ল ঃ	.....	.....	১৫ নববীবর্ষ ২য় হিজরীসন ৬২৪ খৃষ্টাব্দ
১৮. বদরের যুদ্ধ ঃ	শুক্রবার	১৭ ই রমাযান ১৩ই মার্চ	১৫ নববীবর্ষ ২য় হিজরীসন ৬২৪ খৃষ্টাব্দ
১৯. মদ হারাম হ'লঃ	.....	.....	১৬ নববীবষ ৩য় হিজরীসর্ন ৬২৫ খৃষ্টাব্দ
২০. মহিলাদের পর্দা ফরয হ'লঃ	শুক্রবার	১লা যুলকা'দা	১৭ নববীবর্ষ ৪র্থ হিজরীসন ৬২৬ খৃষ্টাব্দ
২১. হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ	.....	.....	১৯ নববীবর্ষ ৬ষ্ঠ হিজরীসন ৬২৮ খৃষ্টাব্দ
২২. বিশ্বনেতাদের নিকটে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রেরণ শুরুঃ	বুধবার	১লা মুহাররম ১১ই মে	২০ নববীবর্ষ ৭ম হিজরীসন ৬২৮ খৃষ্টাব্দ

http://islaminonesite.wordpress.com

২৩. মক্কা বিজয়ঃ	বৃহস্পতিবার	২০শে রমাযান ১১ই জানুয়ারী	২১ নববীবর্ষ ৮ম হিজরীসন ৬৩০ খৃষ্টাব্দ
২৪. হজ্জ ফরয হ'লঃ	বৃহস্পতিবার	২০শে রমাযান	২২ নববীবর্ষ ৯ম হিজরীসন ৬৩১ খৃষ্টাব্দ
২৫. হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১ম হজ্জঃ	সোমবার	৯ই যুলহিজ্জা	২২ নববীবর্ষ ৯ম হিজরীসন ৬৩১ খৃষ্টাব্দ
২৬, বিদায়ী হজ্জ ঃ	শুক্রবার	৯ই যুলহিজ্জা ৯ই মার্চ	২৩ নববীবর্ষ ১০ম হিজরীসন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ
২৭. অসুখ শুরুঃ	সোমবার	২৭শে ছফর ২৫শে মে	২৪ নববীবর্ষ ১১ হিজরীসন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ
২৮. মৃত্যুঃ	সোমবার (সকালে চাশতের সময়)	১২ই রবীউল আউয়াল ৮ই জুন	২৪ নববীবর্ষ ১১হিজরীসন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ
২৯. দাফন ঃ	মঙ্গলবার দিবাগত রাতে (মৃত্যুর ৩২ ঘণ্টা পরে)	১৪ই রবীউল আউয়াল	৬৪ হস্তীবর্ষ ১১ হিজরীসন ৬৩২ খৃষ্টাব্দ

বিঃ দ্রঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। ঘরে জায়গা কম থাকায় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে দশ দশ জন করে জানাযা পড়ে বেরিয়ে যান। দাফনের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। প্রথমে পরিবারের লোকজন অতঃপর মুহাজেরীন, আনছার ও অন্যান্য পুরুষ, নারী ও বালকগণ জানাযা পড়েন।

[যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম হ'তে প্রকাশিত মাসিক **The straight path** এবং আর-রাহীকুল মাখতূম (বঙ্গানুবাদ) অবলম্বনে]।।

* কা'বা আক্রমনের সময় আবরাহার সাথে বিশাল হস্তীবাহিনী ছিল বিধায় ঐ সাল থেকে হস্তীবর্ষ গণনা করা হয়।

** মি'রাজের সঠিক তারিখ সংগত কারণেই অজ্ঞাত রয়েছে। প্রচলিত মতে ২৭শে রজব হ'লেও তা যুক্তিতে টেকেনা। কেননা মা খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে ১০ম নববী সনের রমাযান মাসে এবং তিনি যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই মারা গিয়েছেন, এতে সবাই একমত।- সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সোনামণিদের পাতা

জুন'৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

হড়গ্রাম শেখপাড়া রাজশাহী, কোর্ট থেকেঃ

মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, মুহাম্মাদ রাজু ইসলাম, মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, সাবেরা আখতার, মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান, মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান, মুহাম্মাদ ইস্তাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ সাহাবুর, নাজনীন আরা, হালীমা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস, রেহেনা খাতুন, মাহফূযা ফেরদৌসী, আরযিনা আখতার, শাকিলা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, রহীমা, শামীমা খাতুন, রাহেলা খাতুন, তাসমিরা খাতুন, কমেলা খাতুন, মাহমূদা খাতুন, নাজমা খাতুন, ময়না খাতুন ও ফাহিমা খাতুন।

পোষ্টাল কমপ্লেক্স, রাজশাহী থেকেঃ সাবিহা সুলতানা।

আলমারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া থেকেঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও মাস'উদ আলম মাহফূয।

জুন'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১। আব্দুল্লাহ, আমেনা, আবু তালিব, আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং আব্দুল ওয়াহ্হাব।

২। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীন বলা হয়। উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর সংখ্যা ১১ জন। তারা হ'লেন-

(১) খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (২) সাওদা বিনতে যাম'আহ্। (৩) আয়েশা বিনতে আবুবকর (৪) হাফছাহ বিন্তে ওমর (৫) যায়নাব বিন্তে খুযায়মাহ (৬) যায়নাব বিন্তে জাহ্শ (৭) জুওয়াইরাহ বিন্তে হারিছ (৮) উম্মে সালামাহ বিন্তে আবী উমাইয়াহ (৯) উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিন্তে আবু সুফিয়ান (১০) ছাফিয়াহ বিন্তে হুয়াই বিন আখত্বা (১১) মায়মূনা বিনতুল হারিছ।

৩। দুইজন। (১) মা খাদীজা (রাঃ) ও (২) মা যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাঃ)।

৪। মা আয়েশা (রাঃ), ৯ বৎসর বয়সে।

৫। প্রথম দুইজন শ্বশুর [হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এবং শেষের দুইজন জামাই ছিলেন [হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)]।

জুন'৯৮ সংখ্যার একটু খানি বুদ্ধি খাটাও-এর সঠিক উত্তরঃ

(১) জোঁক ও কেঁচো (২) মৌমাছি (৩) বাঘ (৪) মাছি, ঘণ্টায় ৯৬৬ কিঃ মিঃ (৫) প্লাটিপাস।

জুলাই '৯৮ সংখ্যা সাধারণ জ্ঞান

১। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর স্ত্রীদের মধ্যে কতজন কুরায়শী ছিলেন এবং কতজন আরবের অন্যান্য গোত্রের ছিলেন?

২। মহানবী (ছাঃ)-এর একজন মাত্র অনারব ইয়াহুদী গোত্রের স্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম কি?

৩। রাসূলের (ছাঃ) স্ত্রীদের মধ্যে দু'জনের মর্যাদা সর্বাধিক, তাঁদের নাম কি?

৪। নবী (ছাঃ) -এর সঙ্গে খাদীজার বিবাহের প্রস্তাব দেন এক মহিলা, তার নাম কি?

৫। রাসূল (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ) -এর সঙ্গে বিবাহের সময় মোহ্রানা স্বরূপ কি দিয়েছিলেন?

জুলাই '৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

১। কোন্ প্রাণী দাঁড়িয়ে এবং কোন্ প্রাণী চোখ খুলে ঘুমায়?

২। কুকুর ও বিড়াল কেন ঘাস খায়?

৩। শব্দ করতে পারে না এমন দু'টি প্রাণীর নাম বল?

৪। এমন কোন্ প্রাণী আছে, যার কান নেই জিহ্বা দিয়ে শুনে?

৫। মরুভূমির জাহাজ এবং সামুদ্রিক দৈত্য কোন্ কোন্ প্রাণীকে বলা হয়?

সত্য কথা বলা

-আহমাদুল্লাহ (তৃতীয় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা রাজশাহী

মিথ্যা কথার বহর নিয়ে
কেউ পারে না টিকতে,
কেউ পারেনা মিথ্যা বলে
সব কথা কাজ করতে।
সত্য কথা বললে তবে
সবাই বাসে ভালো,
দাও প্রভু হৃদয় জুড়ে
সত্য জ্ঞানের আলো।

***

দ্বীনের খাদেম

-মুহাম্মাদ ওবাইদুর রহমান (৩য় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি নাম যে আমার
যার নেই কোন তুলনা,
সোনামণি বলে ডাকবে সবাই
এটাই মোদের কামনা ।
সোনামণি করব মোরা

http://islaminonesite.wordpress.com

শুনবনা কারো মানা,
সোনামণি করব মোরা
মানব শয়তানী কুমন্ত্রণা।

***

বুঝিয়া পড়ো

-মাহফূযুল ইসলাম
হলিধানী, ঝিনাইদহ

সোনামণি, সোনামণি
আমার কথা শুনো,
তোমায় দিব তাহরীক কিনে
রাসূলের কথা মানো।
তাহরীক পড়ো মনোযোগের সাথে
আল্লাহ্‌র পথে চলতে।
বাঁধা যত আসুক তাতে
ঝাঁপিয়ে পড়ো আল্লাহ্‌র পথে।
তিনি যদি সহায় থাকেন
সকল বিপদ উদ্ধারিবেন।
তিনি হ'লেন সবার সেরা
সকল দেশের রাজা,
তাঁর পথেই মোরা গড়ব জীবন
আমরা সকল প্রজা।

***

জাগো মুসলিম

-আশরাফুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী)
মনপিরি মাদরাসা, লক্ষীচামারী
বড়াইগ্রাম, নাটোর

জাগো মুসলিম তরুন দল
জাগো নিয়ে ঈমানী বল।
জিহাদের পথে এগিয়ে চল
আল্লাহ তোদের দিবেন ফল।
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমরা
হয়েছি মুসলিম জাতি।
কুরআনের বিধান চালু করে
হব মোরা বিশ্ব খ্যাতি।
মোরা অহি-র বিধান চালু করবো
সোনামণি হয়ে সোনার মত মানুষ গড়বো।

তাহরীক

-শারমীন আখতার (৭ম শ্রেণী)
হাতেম খাঁ, রাজশাহী

অন্য পত্রিকা জানে কিভাবে মানুষকে
ঠকাতে হয়।
আত-তাহরীক তুমি কত সুন্দর!
তুমি জান কিভাবে মানুষকে
মানুষ করতে হয়।
আত-তাহরীক কে অবহেলা করনা!
সত্যের পথ ছেড়োনা।
দুঁনিয়া ও আখেরাতে চাও যদি মুক্তির নিশানা
তাহরীক কিনে পূরণ কর বাসনা।

***

সোনামণি সংবাদ জুলাই'৯৮

সোনামণি শাখা গঠনঃ

১৮। হাতেম খাঁ (দক্ষিণ) শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আরিফুর রহমান

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোহাগ আলী

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রাজিব হোসাইন

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সোহান আলী, জিহাদুর রহমান ও জিতু হোসাইন

১৯। হাতেম খাঁ (দক্ষিণ) বালিকা শাখা, রাজশাহী মহানগরীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ শারমীন আখতার

উপদেষ্টাঃ যুলফিয়া নাসরীন

পরিচালিকা ঃ শামীমা সুলতানা

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ পারভীন আখতার, সুরাইয়া তন্নী, সাবীহা খাতুন ও রাখিয়া খাতুন।

সোনামণিদের বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৫/৯৮ তারিখ সকাল ১০ টায় সোনামণির ৫টি শাখার উদ্যোগে শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত হাদীছ, ছালাতের নিয়ম-পদ্ধতি ও দু'আ, ধাঁ ধাঁ ও মেধা পরীক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞান এই তিনটি বিষয়ের উপর ৬টি গ্রুপের প্রায় ১০০ জন সোনামণি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

বাদ আছর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার যুবসংঘ এবং আন্দোলনের সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এলাকার সোনামণিদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজেতাদের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন আহালেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান। প্রধান অতিথি ও সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে এ সংগঠনের গুরুত্বের উপর সারগর্ভ ভাষণ দেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

কুমিল্লায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্য মজুরি হ'তে

কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানে ৬ থেকে ১৪ বছরের হাযার হাযার শিশু শ্রমিক বিভিন্ন কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থায় প্রত্যহ গড়ে ১৪ ঘন্টা নিরলসভাবে পরিশ্রম করেও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু শ্রমিক সামর্থের বাইরে ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে অকালে মৃত্যুবরণ নচেৎ পঙ্গত্ব বরণ করছে। জানা গেছে কুমিল্লা শহর ও শহরতলীসহ ১২টি থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের ৫/৬ বছরের শিশুকে ভরণপোষণ ও অর্থ উপার্জনের জন্য উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ভৃত্য বা চাকর হিসাবে বা হোটেল-রেস্তোরার বয় হিসাবে বা ক্ষুদ্র কল-কারখানার কাজ-কর্মে নিয়োজিত করা হয়। মূলতঃ এ বয়সে এসব শিশুর বই হাতে নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার কথা। তার বদলে দারিদ্রের কারণে ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য তাদের হাতে হাতুড়ি দিয়ে পাঠানো হয় কল-কারখানায় কঠোর শ্রমের জন্য। প্রত্যহ সকাল ৭/৮টার মধ্যে কিছু মুখে না দিয়েই শুরু হয় তাদের কাজ এবং শেষ হয় রাত ১০টায়। আবার কোনদিন গভীর রাত পর্যন্ত। কাজ চলাকালীন সময়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে তাদের ক্ষুধা মেটাতে হয়। বিভিন্ন কল-কারখানা, কামার-কুমারের দোকান, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রীর যোগান, সাইকেল রিপেয়ারিং, হোটেল-রেস্তোরায় অধিক সংখ্যক শিশুকে কঠোর শ্রম দিতে দেখা যায়। আবার অনেক শিশু ও কিশোররা প্রত্যহ গড়ে ১৪ ঘন্টা শ্রম দিয়েও তাদের প্রদত্ত শ্রমের আশানুরূপ বা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। বরং সামান্যতম অবহেলা, ত্রুটির কারণে তাদেরকে সহ্য করতে হয় অমানুষিক নির্যাতন। তাছাড়া খোদ কুমিল্লা শহরে আশংকাজনকভাবে শিশু-কিশোর রিকশাচালকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আনাড়ি, অদক্ষ এসব রিকশাচালক অহরহ ঘটাচ্ছে মারাত্মক দুর্ঘটনা। সংসারের প্রচণ্ড অভাব-অনটন, অনেকটা পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা উপায়ান্তর না দেখে অল্প বয়সে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ রিকশা চালনার পথ বেছে নিয়েছে বলে তাদের কাছ থেকে জানা যায়।

ছাত্র রাজনীতির ঘোর বিপক্ষে ৭১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী

'বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতি'- বিষয়ের ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সাম্প্রতিক এক জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে শতকরা ৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী এখন ছাত্র রাজনীতির ঘোরতর বিপক্ষে। মাত্র ২৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে ছাত্র রাজনীতির সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। বাকীরা কোন মতামত দেননি। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মানব সাহায্য সংস্থা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই জরীপের আয়োজন করেছিল। ছাত্র রাজনীতি বিষয়ক জরীপে মোট ১ হাযার ৩৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। জরীপের ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে লিখিত রিপোর্টে বলা হয়, ছাত্র রাজনীতি তার অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে দিনের পর দিন আরো কলুষিত হচ্ছে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এছাড়া ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে ছাত্র নয় বরং অছাত্র ও বহিরাগত সন্ত্রাসী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হচ্ছে।

অনাহার ও অপুষ্টির শিকার উত্তরাঞ্চলের দেড় লক্ষ শিশু রাতকানা ও অন্ধ

উত্তরাঞ্চলে দেড় লক্ষ শিশু রাতকানা ও অন্ধ। জীবনী শক্তিহীন এইসব শিশু পরিবারের জন্য দুঃখের কারণ। উত্তর জনপদের অভাবী অঞ্চল যেমন- রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও বগুড়া ইত্যাদি জেলায় এদের জন্ম। জন্মের পর তাদের মুখে পুষ্টিকর খাদ্য জোটেনি, ভাগ্যে জোটেনি সরকারী স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা। যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা নদ-নদীর চরাঞ্চলসহ দুর্গম চলনবিল এলাকার মানুষ জানে না ভিটামিন এ বা ঔষধ পথ্যের কথা। স্বাস্থ্য সেবায় সরকারী মাঠ কর্মীদের কথাও তারা জানে না।

ইউনিসেফ ও বেসরকারী সাহায্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় শিশু টিকাদান কর্মসূচী সফল হচ্ছে না। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পরিবারের সদস্যরা দিন মজুর। অভাব-অনটন ছাড়াও অশিক্ষা, কুশিক্ষা সর্বোপরি সুযোগের অভাবে উত্তর জনপদের মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি। অভাবী পরিবারের এই সব শিশুরা ভিক্ষায় নামতে বাধ্য হয়েছে। এ অঞ্চলের ৪০ ভাগ মানুষকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ৪০ ভাগ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল হ'তে বঞ্চিত।

বয়স্ক ভাতা চালু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর উদ্বোধন করেছেন। টুঙ্গিপাড়া হ'তে এই কর্মসূচী শুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী এলাকার ৬০ জনের হাতে বয়স্ক ভাতার পাশ বই ও দু'মাসের ভাতা তুলে দেন। এই কর্মসূচীর আওতায় ইউপির প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১০ জনকে ১০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হবে। ইতিমধ্যে ৪ লাখ ৩

http://islaminonesite.wordpress.com

হাযার ১শ ১০ জনের তালিকা তৈরী হয়েছে। চলতি এপ্রিল হ'তে এ ভাতা কার্যকর হবে। এতে খরচ হবে বছরে ৫০ কোটি টাকা।

আগামী অর্থ বছরের (১৯৯৮-৯৯) জন্য ৩০ হাযার ৯৬ কোটি টাকার নতুন বাজেট

অর্থমন্ত্রী শাহ এ, এম, এস কিবরিয়া গত ১১ জুন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে আগামী অর্থবছরের জন্য ৩০ হাযার ৯৬ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে সকল প্রকার কসমেটিক্স, ঘড়ি, সিমেন্ট, সিরামিক, মেলামাইন তৈজসপত্র, ফোম, সিগারেট, এয়ার কণ্ডিশনার, ফ্রিজ, এরোসল, এয়ার ফ্রেশনার, কার্পেটসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে কম্পিউটার, প্লাস্টিক ও পলিথিন পণ্য কৃষি নির্ভর শিল্প, চামড়া শিল্প ও বস্ত্র শিল্প ব্যবহার্য কাচামালের উপর শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এক নজরে বাজেট

মোট রাজস্ব আয়	= ২০,৭৭৬	কোটি টাকা
মোট রাজস্ব ব্যয়	= ১৫,৯৩৭	কোটি টাকা
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	= ৪৮৩৯	কোটি টাকা
উন্নয়ন বাজেট	১৩৬০০	কোটি টাকা
সামগ্রিক বাজেট অর্থ	৩০০৯৬	কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি	৯৩২০	কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	৫৯০৭ (৫৪%)	কোটি টাকা
আভ্যন্তরীন সম্পদ	৬২১৮ (৩৬%)	কোটি টাকা

যমুনা সেতুর উদ্বোধন

অবশেষে বহু কাংক্ষিত দীর্ঘ প্রত্যাশার যমুনা বহুমুখী সেতু স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ নিল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে এই সেতু এককভাবে একটি সুস্পষ্ট মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। খুলে গেছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। এর ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল সরাসরি সড়ক ও রেল পথে রাজধানীর সাথে সম্পৃক্ত হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের প্রায় ৩ হাযার আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালের মন্ত্রীবৃন্দ, কূটনীতিক, দাতা সংস্থা প্রধান, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, তিনবাহিনী প্রধান। গত ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুটি উদ্বোধন করেন।

এক নজরে যমুনা সেতু

১। যমুনা সেতু নির্মাণ ব্যয়	৩৮৫০	কোটি টাকা
২। শুধুমাত্র মূল সেতু নির্মাণ ব্যয়	৯৫০	কোটি টাকা
৩। সেতুর দৈর্ঘ্য	৪.৮	কিলোমিটার
৪। সেতুর প্রস্থ	১৮.৫	মিটার
৫। সেতুর স্প্যান সংখ্যা	৪৯	টি
৬। ডেক সেগমেট সংখ্যা	১২৬৩	টি
৭। পাইন (পিলার) সংখ্যা	১২১	টি
৮। পিয়ার সংখ্যা	৫০	টি
৯। সড়ক লেন	৪	টি
১০। নির্মাণ কাজ শুরু হয়	১৬ অক্টোবর ১৯৯৪	সাল
১১। নির্মাণকারী সংস্থার নাম	কোরিয়ার হিউন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনস্ট্রাকশন কোম্পানি	
১২। এই সেতুতে বাংলাদেশের কোন উপাদান ব্যবহার হয়েছে	সিলেটের বালি ও পাথর	
১৩। যমুনা সেতুর পাইনের গড় উচ্চতা কত?	৮৩ মিটার [৭২ মিটার নদীগর্ভে]	
১৪। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে যমুনা সেত বিশ্বের	-একাদশ তম	
১৫। যমুনা সেতুর ওজন	প্রায় ৭ লাখ টন	
১৬। সেতু নির্মাণে শ্রম দিয়েছেন	প্রায় ১৮ লাখ ব্যক্তি	
১৭। যমুনা নদী	বিশ্বের ৪র্থ দীর্ঘতম নদী	
১৮। সেতুর দুই প্রান্তে সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়েছে	-৩১ কিঃ মিঃ	

১৯। সেতুতে অন্যান্য সুবিধাঃ
রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন,
গ্যাস সরবরাহ লাইন, টেলিযোগাযোগ লাইন

২০। সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন
প্রথমঃ ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ (হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ)
দ্বিতীয়ঃ ১০ এপ্রিল ১৯৯৪ (বেগম খালেদা জিয়া)

২১। যমুনা সেতু উদ্বোধন হয় -২৩ জুন ১৯৯৮ ইং সাল

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাসের পরলোকগমন

ইংলিশ চ্যানেলে বিজয়ী ও জাতীয় পদকপ্রাপ্ত সাঁতারু ব্রজেন দাস গত ১লা জুন সকালে ভারতের কলিকাতায় একটি নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর দেয়া হয়। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। বিশ্বখ্যাত বাঙ্গালী সাঁতারু ব্রজেন দাস চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস আগে কলিকাতায় গিয়েছিলেন। তিনি ক্যান্সারে ভূগছিলেন। ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস ছিলেন প্রথম এশিয় সাঁতারু যিনি ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ১৯৬১ সালে সাঁতারে ৩টি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদেশ

নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্যাখ্যান

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এড়ানোর লক্ষ্যে বাস্তব নিরস্ত্রীকরণ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আহবান জানিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, নতুন দিল্লী তা প্রত্যাখ্যান করেছে। গত ৬ জুন জাতিসংঘে প্রকাশিত ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি, নিরাপত্তা পরিষদ যেসব বিষয় নিরসন করতে চাচ্ছে, তাদের কাজ এবং গৃহীত প্রস্তাবটি সেগুলোর জন্য সহায়ক হবে না'।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পরিষদের ১৫টি সদস্য দেশ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। এতে ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পারমাণবিক পরীক্ষার নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) এবং ব্যাপক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (সিটিবিটি)-তে স্বাক্ষর করার জন্য দেশ দু'টির প্রতি আহবান জানানো হয়। তবে ভারত এনপিটিকে বিশ্বের পারমাণবিক ও অপারমাণবিক দেশসমূহের এক অসম ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করে তা নাকচ করে দেয়।

পাকিস্তানও প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা নিরাপত্তা পরিষদের নেই।

ভারতে 'রাম মন্দির' নির্মাণের প্রস্তুতি

ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দু সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র তত্ত্বাবধানে রাজস্থানের তিনটি ও উত্তর প্রদেশের একটি ওয়ার্কশপে 'অযোধ্যার রাম মন্দির' নির্মাণের প্রস্তুতির কাজ চলছে বলে দি উইক পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে। পত্রিকাটিতে বলা হয়, বিজেপি কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করুক আর নাই করুক আগামী ২ বছরের মধ্যেই অযোধ্যার নির্ধারিত স্থানে রাম মন্দির নির্মাণ শুরু হবে বলে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাম মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠন 'রাম মন্দির ন্যাসে'র উপ-প্রধান মহন্ত নৃত্যগোপাল দাস বলেন, রাম মন্দির নির্মাণের যাবতীয় কাজ এগিয়ে চলছে। ফলে অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানটিতে মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু হ'তে এবং তা সমাপ্ত হ'তে বেশী সময় লাগবে না।

ভারতের সাথে পাকিস্তানের 'অনাক্রমণ' চুক্তির প্রস্তাব

সফল পারমাণবিক পরীক্ষার পর চিরশত্রু ভারত ও পাকিস্তান আবার নূতন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নে সারা বিশ্ব যখন উদ্বিগ্ন তখন ইসলামাবাদ নয়াদিল্লীর সাথে 'অনাক্রমণ' চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিয়েছে। নয়াদিল্লী হ'তে এই প্রস্তাবের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভারত ও পাকিস্তান তিন বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বিগত ১৯৮৯ সাল হ'তে কাশ্মীর সীমান্তে হর-হামেশা গুলি বিনিময় হচ্ছে। বৃটেন, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া সহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ মনে করে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর এই দুই প্রতিবেশী আবার যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে পারে। এই প্রেক্ষাপটে বিবদমান দুই রাষ্ট্রকে পুনরায় আলোচনায় বসার জন্য পশ্চিমা দেশগুলি আহবান জানিয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত ও পাকিস্তান বৈঠকে বসেছে; কিন্তু তাদের মধ্যকার বিরোধ মিটাতে পারেনি। পর্যবেক্ষকগণ বলেন, ভারত ও পাকিস্তান যাতে আবার আলোচনা বৈঠকে ফিরে আসে সেজন্য পশ্চিমা দেশগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। নতুবা শুধু অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ক্ষান্ত থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি আসবে না।

চীনে খনি দুর্ঘটনায় নিহত ৬৩৪

চীনে এ বছর এপ্রিল ও মে মাসেই ৭৬ টি বড় ধরনের খনি দুর্ঘটনায় ৬শ ৩৪ জন নিহত হয়েছে। চীনের এক দৈনিক পত্রিকায় একথা জানানো হয়। পত্রিকায় বলা হয় এপ্রিল মাসে ৪৫ টি দুর্ঘটনায় ৩৩১ জন প্রাণ হারায়।

গত বছরও চীনে কয়লা খনি দুর্ঘটনায় ২ হাযারেরও বেশী শ্রমিক নিহত হয়। এ সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশী।

শ্রীলংকায় ৭ দিনে সংঘর্ষে দু'পক্ষের ৪৩৩ জন নিহত

শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলে ৭ দিন একটানা সংঘর্ষে সরকারী সৈন্য এবং তামিল গেরিলাদের উভয় পক্ষের ৪ শত ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষে ১০ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ২ শত ৮ জন সৈন্য নিহত এবং ১ হাযার ৩শত ২৪ জন সৈন্য আহত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল গেরিলাদের ২শত ২৫ জন সৈন্য নিহত হয় এবং তাদের আহতের সংখ্যা ২ শত। জাফনার সঙ্গে সংযোগকারী সড়কের মানকুলাম এলাকায়

http://islaminonesite.wordpress.com

তামিলরা তাদের শেষ অবস্থান রক্ষার চেষ্টা করছে। গত বছর মে মাস থেকে সড়কটির দখল নিয়ে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ চলছে।

ভারতে তাপদাহে মৃতের সংখ্যা ৩০২৮

ভারতে তাপদাহের ফলে মৃতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাযারে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশের মোট প্রাণহানির অর্ধেকই উড়িষ্যায়। অন্ধ প্রদেশে মারা গেছে প্রায় সাড়ে ৯শ লোক। তাপদাহ রাজধানী নয়াদিল্লীতেও আঘাত হানে।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গে মসজিদে মাইকে আযান বন্ধ ঘোষণা

হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার বিজেপি ভারতের পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলিকাতার আড়াইশ' মসজিদে মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই অমানবিক নৈরাশ্যজনক কাজ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আঘাত হানল। এরূপ নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ পৃথিবীর মানচিত্রে নেই। প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করার অধিকার আছে। কিন্তু হিন্দু শাসিত ধর্মদ্রোহী সরকার ভারত আজ ধর্মান্ধতায় মেতে উঠেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ভারত মুখে বড় কথা বলে; কিন্তু প্রকাশ্যে তারা মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্থান সমূহে আঘাত হানছে।

তারা মুসলমানদের আযান বন্ধ করেছে একটি মাত্র অজুহাতে তা হল শব্দদূষণ। এই অপ্রীতিকর ঘটনা সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্‌র ধর্মীয় অনুভূতিতে এক বিরাট চপেটাঘাত করল। ২/৩ মিনিটের আযানের উপর শব্দ দূষণের অভিযোগ আনা ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতারই পরিচায়ক। কিন্তু পূজার সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যে শব্দ ও ডামাডোলের সাথে পূজা-পার্বন অনুষ্ঠান করে তাতে কি কোন শব্দ দূষণ হয় না? তাছাড়া রাস্তায় গাড়ীর হর্ণ, ক্যানভ্যাসারের বক্তৃতা, মাইকে গান-বাজনা সারাক্ষণই চলতে থাকে তাতে কি শব্দ দূষণ হচ্ছে না? আযান নিষিদ্ধ করার একটাই কারণ হচ্ছে, ইসলামের কণ্ঠ রোধ করা। পশ্চিম বঙ্গ থেকে সংখ্যা লঘু মুসলমানদের বিতাড়িত করার হীন পায়তারা হচ্ছে এ সরকারের পরিকল্পনা। কিন্তু সারা বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানদের অস্তিত্বকে দমিয়ে রাখা যাবেনা। তাই কলিকাতার মসজিদ সমূহে মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা প্রত্যাহার, মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুভূতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে বেসরকারী বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

আফগান তালেবানরা তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর দায়ে কাবুলে অবস্থিত সমস্ত বেসরকারী বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। আফগান মন্ত্রী এর কারণ হিসাবে বলেন, স্কুলগুলো ইসলামী শরীয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে এবং তালেবান শাসনের রীতিনীতি ভঙ্গ করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সব স্কুল ও মহিলা সংস্থাগুলো এনজিওদের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছিল।

চলতি বছরেই ফিলিস্তিনের সাথে ইসরাইলের সমঝোতার সম্ভাবনা

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, পশ্চিম তীর হ'তে অংশিক ইসরাইলী প্রত্যাহার প্রশ্নে এই বছর শেষ হওয়ার আগেই প্যালেষ্টাইনীদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। নেতানিয়াহু সংবাদিকদের বলেন, 'আমি যখন জানি আমাদের মধ্যে একটি ভাল চুক্তি রয়েছে, তাই আমি সর্বশক্তি দিয়ে এই চুক্তির প্রতি সমর্থন দিবো।' তবে তিনি এও বলেন, যে কোন চুক্তিতে ইসরাইলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা পশ্চিম তীরের ১৪০ টি ইহুদী বসতির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারবেনা।

প্রবল বর্ষণের কারণে আফগানিস্তানে ত্রাণ তৎপরতা ব্যাহত

প্রবল বর্ষণের কারণে উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানে ত্রাণ তৎপরতা মন্থর হয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় ৫ হাযার লোক নিহত হয়। হাযার হাযার লোক খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মকর্তা গিলবার্ট গ্রীনাল বলেন, আমরা তাজিকিস্তান থেকে জ্বালানিসহ একটি বিমান আসার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে বিমানটি আসতে পারছেন না। এছাড়া পাহাড় পরিবেষ্টিত ফায়জাবাদ বিমানবন্দরে রাশিয়ার সামরিক বিমান অবতরণ করতে পারছে না। ৫০টি গ্রাম পুরাপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। রেড ক্রস কর্মকর্তা জুয়ান মার্টিনেজ বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত অন্য গ্রাম গুলোতে পৌঁছতে আরো দুই-একদিন সময় লেগে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রস্তাব এবং রাশিয়ার সমর্থন

যুক্তরাষ্ট্র গত ১৮ জুন প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যে, ইরান সম্পর্কোন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ সাড়া দেবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এ ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন অলব্রাইটের ভিত্তি রচনামূলক ভাষণের অনুমোদন দিয়েছেন। বিল ক্লিনটন বলেন, আমরা পারস্পরিক এবং দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিক প্রকৃত সমঝোতা চাই। ১৯৮০ সালে ইরানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র এই ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সম্ভাবনার কথা বলেছে। ইরান এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। এদিকে তেহরান এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের মার্কিন প্রস্তাবকে রাশিয়া স্বাগত জানিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ

সৌদি আরবের কোটিপতি ও ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিল লেভেস সম্প্রতি "International Islamic Front for Jihad" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সংগঠন সৌদি আরব সহ অন্যান্য আরব দেশ হ'তে মার্কিন সৈন্য বাহিনী উৎখাত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। জনাব লেভেস বলেছেন যে, বেশ কয়েকটি ইসলামী আন্দোলনের নেতা তার ফ্রন্টে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার দাবী অনুসারে আফগানিস্তানের তালিবান নেতা মোল্লাহ মুহাম্মাদ ওমর ফ্রন্টের পৃষ্টপোষকতা করছে।

সাত বছরের বালকের বিস্ময়কর কুরআন প্রতিভা

ইরানের ৭ বছরের এক বিস্ময়কর প্রতিভাবান বালক মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতেবাই তার প্রখর স্মৃতিশক্তি আর পবিত্র কুরআনের উপর তার সুগভীর পাণ্ডিত্যে সবাইকে হতবাক করে দেয়। গত ১৮ মে দোহার আল-আরাবী স্পোর্টস ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে তিন হাযাবের অধিক মানুষ তার বক্তব্য শোনার জন্য ছুটে যায়। গত ২ বছর যাবত বালকটি পবিত্র কুরআনের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে সে যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের উপর তার ৪টি বই প্রকাশিত হচ্ছে বলে তার পিতা মুহাম্মাদ মাহদী জানান।

৫ মে '৯৯ স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন

একজন ফিলিস্তিনী মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ আগামী এক বছরের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার পরিকল্পনা করছে। উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রী হান্নান আশরাবী গত ২৯ এপ্রিল ওয়াশিংটনে বলেন, আগামী বছর ৫ মে স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কেবলমাত্র নীতি গ্রহণের পরিবর্তে বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার আহবান জানান।

বিশ্বের বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণে সাদ্দামের পরিকল্পনা

ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসাইন বিশ্বের বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন এবং এজন্য তিনি ফরাসী স্থপতিদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফ্রান্স মরক্কোতে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ এবং প্যারিসের দৃষ্টি নন্দিত গ্রাণ্ড আর্চ ও লুভ্যর মিউজিয়ামের কাঁচের পিরামিডের নির্মাতা। একারণে সাদ্দাম মুসলিম জনগণের প্রার্থনার জন্য বিশাল মসজিদ বানানোর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ফরাসী স্থপতিদের দিকেই ঝুঁকেছেন। যা ইরাকের লৌহ মানবের স্বাক্ষর বহন করবে।

ইরানে প্রথম মহিলা পত্রিকা

ইরানের পার্লামেন্টের একজন বিশিষ্ট মহিলা সদস্যা এ মাসের শেষদিকে দেশের প্রথম নারী বিষয়ক পত্রিকা বের করছেন। তিনি বলেন, তার পত্রিকার নাম 'দৈনিক যান-ই-রোয' অর্থাৎ আজকের নারী। এর লক্ষ্য হচ্ছে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো এবং সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, সামাজিক জীবনে মহিলাদের উপস্থিতির মানে এই নয় যে, তারা পারিবারিক জীবনকে অবহেলা করছে। ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানির কন্যা ফায়েয হাশেমী দেশের বর্তমান ইসলামী আইনের আওতায় মহিলাদের অধিকার রক্ষায় একজন সক্রিয় প্রবক্তা।

মিসরের সাগর বুকে ও মরুভূমিতে ৬টি তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার

মিসরের তেল মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানায়, বৃটিশ, ইতালীয় মার্কিন, তিউনিসীয় কোম্পানী ও বিশেষজ্ঞগণ মিসরের পশ্চিম মরুভূমি এলাকায় ৬টি নূতন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। মিশরের তেল মন্ত্রী জানান, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৮২ সাল হ'তে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান ও আহরণের কাজে এ যাবৎ ১৮০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। এ বছর ১ জুলাই হ'তে মিসরের দৈনিক অশোধিত জ্বালানী তেল আহরণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ লাখ ২০ হাযার টন।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সারের ঔষধ আবিষ্কার

অবশেষে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের ঔষধ আবিষ্কার হ'তে চলেছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সবকিছু যদি ঠিকঠাক মতো চলে, তবে আগামী এক বছরের মধ্যে একজন রোগীর দেহে ক্যান্সার নিরাময়ের ইনজেকশন পুশ করা হবে। এই ইনজেকশন সব ধরনের ক্যান্সার নিরাময়ে সক্ষম। ইতিমধ্যে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এর কোন স্পষ্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা প্রতিরোধ নেই। নতুন ড্রাগের পরীক্ষা এখনও মানুষের উপর চালানো হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের পরিচালক ডাঃ রিটার্ড ক্লাউসনার বলেন, রোগীর দেহে নূতন এই ড্রাগের পরীক্ষা চালানোর কাজই হচ্ছে আমাদের সামনে এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ গবেষণা শেষ হবার পরেই বাজারে আসছে ক্যান্সার চিকিৎসায় সক্ষম পি-৫৩ জিন থেরাপি। বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ এধরনের আবিষ্কার এখনও সুদূর প্রসারী। তবে বিশ্ববাজারে পি-৫৩ জিন থেরাপি বাজারজাত হওয়া মাত্রই বাংলাদেশের রোগীদের কাছে এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। কোম্পানি এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

বাউনেট এখন যোগাযোগের নূতন মাধ্যম

আমরা সবাই জানি ইন্টারনেট আধুনিক যেগাযোগ ব্যবস্থার একটি অনন্য সহজলভ্য ত্বরিত মাধ্যম। অতি সহজে অনায়াসে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তরে ইন্টারনেটের সাহায্যে যোগাযোগ করা সম্ভব। মুহূর্তেই ঘরে বসে দেশ-বিদেশের খবরাখবর পাওয়া সম্ভব হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট নিয়ামক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটরা উচ্চ শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। কৃষি গ্রাজুয়েটরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বসবাস করে নিজেদের মধ্যে অন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করেছেন। খবর নিচ্ছেন দেশের, নিজেদের। বাউ (BAU-Bangladesh Agriculture University) গ্রাজুয়েটরা মিলে সৃষ্টি করেছেন বাউনেট। সকলেরই ইন্টারনেট অ্যাড্রেস রয়েছে বাউনেট। নিজেদের অভিব্যক্তি, মতামত, রাজনৈতিক ভাষা, দেশপ্রেম, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আচরণ, রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে মত বিনিময় করছেন বাউনেটের সাহায্যে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বাউ-গ্রাজুয়েটরাই সর্বপ্রথম এ ধরনের সর্ব সুফলভোগী যোগাযোগের সহজ মাধ্যম বাউনেট সৃষ্টি করেছেন। ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী, বিস্তৃত হচ্ছে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। বাউনেট বেঁধেছে বিদেশ-বিভূঁইয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সতীর্থদের একই সূত্রে মায়ার ডোরে।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর এক সাফল্য

ব্রিটিশ শল্যবিদরা হাতের বুড়ো আঙুলের আকারের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড একজন রোগীর দেহে সংযোজন করতে যাচ্ছে। লণ্ডনের সানডে টাইমস এ খবর দিয়েছে। এই টাইটানিয়াম মিনি হার্ট আমেরিকায় তৈরী করা হয়েছে। বিশ্বে এটিই প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড যা সংযোজন করা যাবে। শক্তিশালী ক্ষুদ্রাকার এই বৈদ্যুতিক হার্টটি প্রতি মিনিটে আট পাউণ্ড রক্ত পাম্প করতে সক্ষম। এই হার্টটি একটি ক্ষুদ্রকায় টার্বাইনের সাহায্যে চালিত এবং টার্বাইনটি হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের মধ্যে অবস্থিত।

'গুটি ইউরিয়া' প্রযুক্তির ব্যবহারে ধানের ফলন বাড়ে

আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (আই এফ ডি সি) কৃষকদের জন্য একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রযুক্তির নাম 'গুটি ইউরিয়া' প্রযুক্তি। লাভজনক এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ৪০ শতাংশ ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি ধানের বৃদ্ধি পায় ১৫ শতাংশ।

গুটি ইউরিয়া হচ্ছে বাজারে প্রাপ্ত সাধারণ ইউরিয়া থেকে ব্রিকোয়েট মেশিনের সাহায্যে তৈরী এক গ্রাম বা দুই গ্রাম ওজনের ছোট গুটি। এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ আই এফ ডিসির ফার্টিলাইজার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মফীযুল ইসলাম জানান, গুটি ইউরিয়া তৈরীর মেশিন এখন সহজলভ্য। দেশের দু'টি প্রতিষ্ঠান এই মেশিন তৈরী করছে, যা চীনের তৈরী মেশিনের চেয়েও উন্নত মানের। তিনি বলেন, আগামী এক বছরের মধ্যে এ ধরনের ৮০ টি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে বলে আমরা আশা করছি। তিনি জানান, এই প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ২৫ ভাগ অধিক ফলন এবং ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত ইউরিয়া সাশ্রয় হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগঠন সংবাদ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ রাজবাড়ী অনুষ্ঠিত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ রাজবাড়ী গত ২৮ ও ২৯ মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার স্থানীয় পাংশা থানার রোঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক জেলার কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ টাঙ্গাইল অনুষ্ঠিত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ টাঙ্গাইল গত ২৮ ও ২৯ শে মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার স্থানীয় কালিহাতী থানার ছাতিহাটি পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম। টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলার কর্মীবৃন্দ এই প্রশিক্ষণে যোগদান করেন। পূর্ব থেকে সফর রত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফও উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির সপ্তাহ ব্যাপী টাঙ্গাইল সফর

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ গত ২৮শে মে থেকে ১লা জুন পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলা সফর করেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার ছাতিহাটি, দেলদুয়ার থানার মীর কুমুল্লী সহ বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তিনি সকলকে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্লাটফরমে সমবেত হয়ে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহবান জানান। এ সময় তিনি 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। ১লা জুন তিনি মুহাম্মাদ আব্দুল হাই -কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট টাঙ্গাইল জেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্যান্য সদ্যরা হলেন, যুগ্ম আহবায়ক- আব্দুল বাছেত (সখীপুর), সদস্য- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (সখীপুর), মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান (দেলদুয়ার), মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (সখীপুর), মুহাম্মাদ আক্কাস আলী (বাসাইল), মুহাম্মাদ হারূণ ইবনে আব্দুর রশীদ (কালিহাতী) ও ফুলচাঁদ মিঞা (টাঙ্গাইল সদর)।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ঢাকা

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ গত ৪ ও ৫ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরাস্থ তাওহীদ ট্রাস্ট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ঢাকা, গাজীপুর কুমিল্লা, নরসিংদী ও ময়মনসিংহ জেলার কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা) ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

বিশেষ ওলামা বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৬ই জুন শনিবার সকাল ৯ টা হতে রাত ১০ টা পর্যন্ত উত্তরাস্থ তাওহীদ ট্রাস্ট অফিসে রাজধানীতে অবস্থানরত ১৫ জন বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সাথে দীর্ঘ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা আল্লাহ্‌র রহমতে ফলপ্রসু হয়।

আমীরে জামা'আতের ভারত সফর

বিহারের কিষাণগঞ্জে অবস্থিত জামে'আতুল ইমাম বুখারীর উদ্যোগে আয়োজিত দু'সপ্তাহ ব্যাপী ওলামা প্রশিক্ষণে অতিথি প্রশিক্ষক হিসাবে আহালেহাদীছ আন্দোলনের উপরে ৪টি বক্তৃতা করার উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিগত ১৫.৬.৯৮ তারিখে চাপাই নবাবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্ত দিয়ে ভারত গমন করেন এবং ২৫.৬.৯৮ তারিখে একই সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আমন্ত্রণ কারী সংস্থা 'তাওহীদ এ্যাডুকেশনাল ট্রাষ্ট' -এর চেয়ারম্যান আব্দুল মতীন আব্দুর রহমান আস-সালাফীর আমন্ত্রণ ক্রমে তাঁর এই সফরে সফরসঙ্গী ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য আলহাজ্জ এস, এম, মাহমূদ আলম (ঢাকা)। প্রশিক্ষণ শেষে ২১.৬.৯৮ তারিখ বিকালে তিনি পাটনার উদ্দেশ্যে কিষাণগঞ্জ ত্যাগ করেন এবং ২২.৬.৯৮ তারিখে পাটনার ঐতিহাসিক খোদাবখ্শ লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি লাইব্রেরীকে 'থিসিস' উপহার দেন এবং এই বিখ্যাত লাইব্রেরীতে বাংলা বইয়ের মওজুদ গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে, এই লাইব্রেরীতে কোন বাংলা বই নেই বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে আগেই অবহিত করেন এবং বাংলাভাষায় প্রাপ্ত থিসিসটিকে তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

অতঃপর তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার এবং জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পাটনা জংশন হ'তে পূর্বদিকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ছাদেকপুর গমন করেন। মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাদের বংশের পারিবারিক বাসস্থান ইংরেজ কর্তৃক নিশ্চিহ্ন হয়ে ময়লা ফেলার স্থানে পরিণত হয়েছে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম পার্শ্ববর্তী নানমূহিয়াতে বসবাস করেন, যা পাটনা জংশন থেকে পূর্বদিকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানেই বর্তমানে 'ইমারতে আহলেহাদীছ ছাদেকপুর পাটনা' কেন্দ্র অবস্থিত। স্থানটি বর্তমানে 'মীর শিকারটোলা' নামে পরিচিত। ভারতীয় সি. বি. আই -এর অত্যাচারের আশংকায় বিগত তিন বছর যাবৎ 'ইমারত' সাইনবোর্ডটিও সরিয়ে রাখা হয়েছে।

অন্যতম সফরসঙ্গী মিথলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সমস্তীপুর কলেজ -এর উর্দু বিভাগের রীডার ডঃ আনীস ছাদরী (৫৬)-এর নেতৃত্বে তাঁরা ইমারতের কেন্দ্রীয় অফিস পরিদর্শন করে। প্রকাশ থাকে যে, তিনি এখানে পূর্ব পরিচিত এবং ইমারত -এর অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'দাওয়াতে ছাদিক' -এর সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি খোদাবখ্শ লাইব্রেরীতে দীর্ঘ ছয় বছর কর্মরত ছিলেন। দূর্ভাগ্য যে, আমীরে জামা'আত মাওলানা আব্দুস সামী এসময় বাইরে ছিলেন। মারকাযে অবস্থান কারী দফতর ইনচার্জ মাওলানা আমানুল্লাহ সালাফী ও সহকারী মুহাম্মাদ কলীমুল্লাহ্র আদর-আপ্যায়নে তাঁরা অভিভূত হন। মেহমানদেরকে তাঁরা ইমারতের প্রকাশিত সুভেনির'৯৮, পত্রিকা, অন্যান্য পুস্তিকা ও লিফ্লেট সমূহ উপহার দেন এবং ইমারতের নিজস্ব গাড়ী দিয়ে তাদেরকে ভ্রমনে সহযোগিতা করেন। অতঃপর তারা গঙ্গা তীরবর্তী ইমারত পরিচালিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 'জামে'আ ইছলাহিইয়াহ সালাফিইয়াহ' পরিদর্শন করেন। যার নিকটেই গঙ্গার উপর দিয়ে বিখ্যাত ইন্দিরা গান্ধী সেতু (৭+৮=১৫ কিঃ মিঃ) অবস্থিত। অতঃপর তাঁরা সেখান থেকে ছাদেকপুরের ঐতিহাসিক জামে মসজিদে গমন করেন ও স্থানীয় আহলেহাদীছ অধিবাসীদের নিকট থেকে বক্তব্য নোট করেন। এই মসজিদের আশেপাশে বর্তমানে কোন আহলেহাদীছ বসতি নেই, তবে তিনজন আহলেহাদীছ দোকান মালিক আছেন এবং অনতিদূরে 'বাগরিয়াটোলা' হ'তে আহলেহাদীছ ভাইয়েরা এসে মসজিদ আবাদ করেন। হানাফী ভাইয়েরাও এখানে নির্দ্বিধায় ছালাত আদায় করেন। প্রকাশ থাকে যে, পাটনা শহরে ১৪টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ আছে। সব মিলে প্রায় ৫০টি জামে মসজিদ রয়েছে।

পাটনা জংশন থেকে পশ্চিম দিকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মনীর নামক স্থানে আল্লামা ইয়াহ্ইয়া মুনীরীর জন্মস্থান। বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে লেখাপড়া শেষ করে জন্মস্থানে ফিরে গেলেও তিনি বসবাস করেন পাটনা শহরের পূর্ব দক্ষিণে ৯০ কিলোমিটার দূরে 'বিহার শরীফ' নামক স্থানে এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে এখন ১২/১৪ ঘর আহলেহাদীছ আছে। বাকী সবই গোর পূজারী হয়ে গেছে। আহলেহাদীছ অন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র পাটনা জংশন থেকে পশ্চিম-দক্ষিণে ১০ কিলোমিটার দূরে 'ফলওয়ারী শরীফ' -এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আইনুল হক -এর প্রপৌত্র হারূণ এখনো আহলেহাদীছ হিসাবে স্মৃতি আগলে আছেন। ফলওয়ারী শরীফ ও মনীর শরীফের সকলেই এখন গোর পূজারী হয়ে গেছেন।

২২.৬.৯৮ তারিখ নাইট কোচ ধরে কিষাণগঞ্জ মাদ্রাসার শিক্ষক শফিউল্লাহ নাদভীর নেতৃত্বে তারা পরদিন সকাল ৮.৩০ মিনিটে কিষাণগঞ্জ পৌঁছেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইতিপূর্বে তাঁরা শায়খ আব্দুল মতীন সালাফীর সৌজন্যে সিকিম সফর করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ খুলনা অনুষ্ঠিত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ খুলনা গত ১৮ ও ১৯ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নির্মিত স্থানীয় জিন্নাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এত প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। খুলনা, বাগেরহাট গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুর জেলার কর্মীদের উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও সম্ভবতঃ ১৮ জুন বৃহস্পতিবার দেশ ব্যাপী সকাল-সন্ধা হরতাল থাকায় কর্মীবৃন্দের আশানুরূপ সমাবেশ ঘটেনি।

কুমিল্লায় সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান গত ২৭.০৬.৯৮ ইং হ'তে ০৩.০৭.৯৮ইং পর্যন্ত কুমিল্লা জেলায় এক সাংগঠনিক সফর করেন। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে জেলার সক্রিয় সাতটি এলাকায় সাতটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানগুলি হল- জগতপুর মাদ্রাসা, বাতাপুকুরিয়া, কুরপাই মাদ্রাসা, একলারামপুর, ধামতী , আরাগ আনন্দপুর ও বুড়িচং।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১০১)ঃ সূরা জুম'আয় আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ জুম'আর দিন যখন তোমাদেরকে ছালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে আগ্রহ সহকারে এসো এবং বেচাকেনা বন্ধ কর'। এখন প্রশ্ন হ'ল যদি খুৎবার সময় আযান দেওয়া হয়, তাহ'লে মুছল্লীরা কখন আসবে? এ আয়াতের তাৎপর্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান সরকার

দেবীদ্বার, কুমিল্লা

উত্তরঃ সূরা জুম'আর এ আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে, সে আযান যে খুৎবার আযান তা ধ্রুব সত্য, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ এই আয়াত যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি এক আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে খলীফা আবু বকর এবং খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) ও এক আযান দিতেন। কাজেই কেউ যদি এই আয়াতের অর্থ প্রচলিত ডাক আযান বুঝেন, তাহ'লে মারাত্মক ভুল হবে। কেননা সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগে এবং ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে ইমাম মিম্বরে বসলে একটি আযান দেওয়া হ'ত। অতঃপর ওছমানের (রাঃ) যুগে মদীনার লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে মদীনা থেকে কিছু দূরে 'যাওরা' বাজারে আরেকটি আযান বাড়িয়ে দেন।- *বুখারী, মিশকাত ১২৩ পৃঃ।* সাথে সাথে এটাও বুঝে নেয়া ভুল হবে যে, সেই কালে মুছল্লীগণ আযান না শুনে মসজিদে আসতেন না বরং আযানের বহু পূর্ব হ'তেই তাঁরা মসজিদে আসা শুরু করতেন, যার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিনে ফেরেস্তাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যান এবং মসজিদে প্রথম সময়ে আগমনকারীদের নাম লিখেন। অতঃপর প্রথম সময়ে যে ব্যক্তি মসজিদে আসে, সেই ব্যক্তির ছওয়াব ঐ ব্যক্তির মত হয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় উট দান করে। তারপর দ্বিতীয় সময়ে আসা ব্যক্তি গরু দান করার, তৃতীয় সময়ে আসা ব্যক্তি দুম্বা, ৪র্থ সময়ে আসা ব্যক্তি মুরগী এবং ৫ম সময়ে আসা ব্যক্তি যেন আল্লাহ্র রাস্তায় ডিম দান করল। অতঃপর ইমাম যখন মিম্বরে উঠার জন্য বের হন, তখন তাদের খাতা-পত্র গুটিয়ে ফেলেন এবং খুৎবা শুনতে লাগেন। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ।* এতে বুঝা যায় যে, হাদীছে মুছল্লীদেরকে আযানের পূর্বে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ খুৎবার আযান শুরু হলে ফেরেস্তারা নেকী লিখার খাতা-পত্র বন্ধ করে দেন।

উল্লেখিত আলোচনার স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে, সেটা খুৎবার আযান এবং একটি মাত্র আযান যা সকল মুছল্লীর জন্য নয়। মূলতঃ ব্যবসায়ীদেরকে ঐ সময় ব্যবসা ছেড়ে ছালাতের দিকে আসার জন্য আদেশ করা হয়েছে। অথবা আয়াতে মসজিদের নিকটবর্তীদের বুঝানো হয়েছে, যারা আযান শুনতে পান। দূরবর্তীগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন। *-কুরতুবী ১৭-১৮ খণ্ড ৬৮ পৃঃ; ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৯১ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২/১০২)ঃ গাছের প্রথম ফল অনেকেই জুম'আর দিন মসজিদে নিয়ে আসে দান করার জন্য কিংবা অনেকে গরীব দুস্থদের দান করে থাকেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সঠিক ফায়ছালা দিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ

রাজপুর, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ গাছের নতুন ফল মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই। তবে বরকতের দো'আ নেওয়ার জন্য পরহেযগার ব্যক্তির নিকটে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। ছাহাবীগণ নতুন ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যেতেন। তখন তিনি আল্লাহ্র দেওয়া নতুন নে'মতের জন্য দো'আ করে দিতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষ যখন প্রথম ফল দেখতো তখন সে ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসত। অতঃপর তিনি তা হাতে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আমাদের ফলে বরকত দিন! আমাদের শহরে বরকত দিন! আমাদের ছা-এর পরিমাপে বরকত দিন! আমাদের মুদ-এর পরিমাপে বরকত দিন! হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) আপনার বান্দা, দোস্ত ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। নিশ্চয় তিনি মক্কার জন্য দো'আ করেছেন, আর আমি মদীনার জন্য দো'আ করছি তাঁর মক্কার জন্য দো'আ করার মত। অতঃপর তিনি উপস্থিত একটা ছোট বালককে ডাকতেন এবং সেই ফল তাকে দিয়ে দিতেন'। *-মুসলিম-মিশকাত ২৩৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৩/১০৩)ঃ বর্তমান যুগে ছেলেদের মুসলমানী দেওয়ার সময় গরু খাসী যবহ করে দাওয়াত দিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু

http://islaminonesite.wordpress.com

সঠিক? কুরআনও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুযাফফার বিন মুহসিন

বাউসা হেদায়াতী পাড়া

রাজশাহী

উত্তরঃ খাৎনা দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও শারঈ বিধান তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। হাদীছে একে ফিৎরাতে ইসলামের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। *-বুখারী 'গোফ কর্তন' অধ্যায় হাদীছ নং ৫৮৮৯।* অতএব অন্যান্য শারঈ বিধানের মতই এ বিধানটিকে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে পালন করা আবশ্যক। নচেৎ সুন্নাত আমলটিও গোনাহের কাজে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, নবী (ছাঃ) ও ছাহাবা কেরামের যুগের খাৎনা ব্যতীত অতিরিক্ত অন্য কিছু করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং খাৎনা করার কার্য সম্পাদন করাই কেবল খালেছ সুন্নাত। এর অধিক কোন কিছু করা বিদ'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা (প্রকৃত) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।*

(প্রশ্ন ৪/১০৪)ঃ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত কি? যেমন আমাদের এলাকায় ঈদগাহ মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

-হোসনে আরা আফরোয

গ্রাম ও পোঃ বোহাইল, বগুড়া

উত্তরঃ মহানবী (ছাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা উত্তোলন করলেও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেননি। ফলে বিশেষ কোন যরূরী অবস্থা ব্যতীত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত নয়। যদি ধর্মীয় রীতি হিসাবে না করে, তবুও অপ্রয়োজনে তা ঠিক নয়। কেননা এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে অপ্রয়োজনীয় কার্য কলাপের সাথে মিশ্রিত করা হবে এবং সেটিও শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, (সেই মু'মিনগণ সফলকাম) যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত থাকে *(সূরা মু'মিনূন আয়াত ৩)।*

প্রশ্ন (৫/১০৫)ঃ প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে হিন্দুদের বৈশাখী পূজার মেলায় যাওয়া যাবে কি এবং সেই মেলার আয়ের টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে বা তন দেওয়া যাবে কি?

-মাহফূয

বিরামপুর জোয়াল কামড়া

দিনাজপুর

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে মুসলমানদের জন্য বছরে দু'টি উৎসব বা ঈদ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। এই দুই উৎসব ব্যতীত ইসলামে আর কোন জাতীয় উৎসব নেই। সেই উৎসবের নামকরণ যেমনই হোক না কেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিনে উৎসব পালন করতাম। তিনি বললেন, আল্লাহ এই দুই দিনের উৎসবকে উত্তম উৎসবে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা'। *-আবু দাউদ 'ছালাতুল ঈদাইন' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬১।*

আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী (ছাঃ) উক্ত দুই দিনে অন্যান্য যাবতীয় উৎসব নিষেধ করেছেন (ঐ হাশিয়া)। মাযহার বলেন, নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজানসহ কাফিরদের যাবতীয় উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছ তার দলীল। হাফেয ইবুন হাজার বলেন, মুশরিকদের যাবতীয় উৎসবে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অবাঞ্ছনীয় প্রমাণিত হয়েছে। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর বলেন যে, এ সব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে একটি ডিমও উপঢৌকন দেবে, সে শিরক করবে। কাযী আবুল হাসান হানাফী বলেন, এই দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐ মেলা থেকে কোন জিনিষ ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয় সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণ ভাবেও যদি এই মেলা থেকে কোন কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিনে কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও অবাঞ্ছিত। *-মির'আত 'ছালাতুল ঈদাইন' ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪৪-৪৫।*

অনুরূপভাবে ছাবিত বিন যুহাক হ'তে বর্ণিত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) জাহেলী যুগের কোন এক কালে মূর্তিপূজার স্থানে কিংবা তাদের উৎসব স্থানে মানতকৃত জন্তু যবেহ করতে নিষেধ করেন। *-আবু দাউদ ২ খণ্ড পৃঃ ৪৬৯।*

অতএব উক্ত হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রকারেরই কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা বিধিসম্মত নয়। এছাড়া আল্লাহ্র পবিত্র বাণী 'তোমরা তাকওয়া ও নেকীর কাজে সহযোগিতা কর, গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করোনা' সে নির্দেশ তো রয়েছেই। উল্লেখ্য যে, ঐ সকল উৎসবে যে গোনাহের কাজ সমূহ হয়ে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ফলে তাদের মেলায় যাওয়া কিংবা সেই মেলার আয়ের টাকা গ্রহণ করা কোনটাই বিধিসম্মত নয়। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিংবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের বেতন হিসাবে সে টাকা ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৬/১০৬)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আহমদী কাদিয়ানীরা কি? এ সম্প্রদায়ের জন্ম কোথা থেকে এবং এদের শেষ পরিণতি কি? ইমাম মাহ্দী ও দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে? তারা মানুষকে কোন্ কাজের দিকে আহবান করবে?

-তাজুদ্দীন আহমাদ

মহারাজপুর, নাটোর

উত্তরঃ আহমাদী কাদিয়ানী সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহ্র অংশ নয়। কাদিয়ানী তৎপরতা নবুঅতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহী তৎপরতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। এরা ইসলাম প্রচারের নামে ইসলাম ধ্বংসের কাজে লিপ্ত একটি সম্প্রদায়। ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' একবার এ সম্পর্কে আলোচনা করে। আল্লামা ইকবাল তাতে একটি প্রতিবেদন পাঠান। তাতে তিনি লিখেন 'কাদীয়ানী মতবাদ' মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের সমান্তরাল একটি আলাদা নবুঅতের ভিত্তিতে নতুন একটি জাতি সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার নাম'। *-দি ষ্টেটসম্যান ১০ই জুন ১৯৩৫ ইং।*

এ সম্প্রদায়ের জন্ম ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের 'কাদিয়ান' শহরের জনৈক ভণ্ড নবী মির্যা গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮)-এর মাধ্যমে। এদের পরিণতি অন্যান্য অমুসলিম জাতির মতই হওয়া স্বাভাবিক।

ফাতেমা (রাঃ)-এর পরিবার হ'তে ইমাম মাহদীর জন্ম হবে। তাঁর নাম ও পিতার নাম রাসূল (ছাঃ)-এর নাম ও তাঁর পিতার নামে হবে। তিনি অন্যায়ে পরিপূর্ণ দেশকে ন্যায়ে পরিপূর্ণ করবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব হবে ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে। তার একটা চোখ হবে ট্যারা। তার দুই চোখের মাঝে কাফ, ফা, রা ك ف ر লিখা থাকবে। তার এক হাতে আগুন ও এক হাতে পানি থাকবে। যাকে সে পানি বলবে তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর যাকে আগুন বলবে তা হবে ঠান্ডা পানি। ইত্যাদি বহু নির্দশন ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।- মিশকাত 'ক্বিয়ামতের আলামত ও দাজ্জাল' অধ্যায়।

প্রশ্ন (৭/১০৭)ঃ ছালাতের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের কোন পার্থক্য আছে কি? আর ফরয ছালাতের সময় মহিলাদেরকে ইক্বামত দিতে হবে কি-না?

-সাখেরা বেগম

চাপাচিল, পীরব

শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য একইরূপ শারঈ বিধান দিয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছালাত আদায়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যেমন- (১) কোন মহিলা, মহিলাদের ইমাম হ'লে তিনি পুরুষ ইমামের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝেই দাঁড়াবেন।- দারাকুতনী হা/১৪৯২-৯৩, ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ। (২) ইমাম কোন ভুল করলে মহিলা মুক্তাদীগণ মুখে 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে হাত মেরে আওয়ায করবেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃঃ।* (৩) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাগণ বড় চাদর গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় না করলে তার ছালাত হবে না। *-আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৩ পৃঃ।* হাদীছ হাসান। তবে যদি কাপড় এমন হয় যা দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে যায়, তাহ'লে বাড়তি চাদরের দরকার নেই। *-আবু দাউদ, মিশকাত ৭৩ পৃঃ।*

মহিলাদের ইক্বামত দেওয়া বিধিসম্মত। ইবনে ওমর (রাঃ) -কে একদা জিজ্ঞেস করা হল যে, মহিলাদের উপর আযান আছে কি? তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্র যিক্র করতে মানা করব কি? হাফছা (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ইক্বামত দিতেন'। *-মুছান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১ম খণ্ড ২৫৩ পৃঃ।* উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে আযান ও ইক্বামত যিকরের অন্তর্ভুক্ত, যা পালন করা বিধি সম্মত।

প্রশ্ন (৮/১০৮)ঃ সমাজে ছোট ইসতিঞ্জা ও বড় ইসতিঞ্জা কথাটি বহুল প্রচলিত। কথাটি কি শরীয়ত সম্মত? প্রস্রাব করে বাইরে এসে নাচানাচি করা হয় আর বলা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয় যে, ঢেলা না নিলে নাপাকী থেকে যায়। ব্যাপারটা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

-আবুহানীফ সিকদার

মিয়াঁপাড়া, গোপালগঞ্জ

উত্তরঃ ছোট ইসতিঞ্জা বা বড় ইসতিঞ্জা বলে কোন কথা ইসলামী শরীয়তে নেই। পেশাব বা পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তাকে ইসতিঞ্জা বলে। উভয় অবস্থায় যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পেশাব বা পায়খানার জন্য বের হতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে বের হতাম। তিনি তা দ্বারাই ইসতিঞ্জা করতেন। *-বুখারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।* রাসূল (ছাঃ) কখনও শুধু মাটি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বের হ'লে আমি তার পিছে পিছে যেতাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল যে,) তিনি কোন দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে তিনি আমাকে বললেন, কয়েকটি কংকর চাই যা দ্বারা আমি ইসতিঞ্জা করব'। *-বুখারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ*। তবে মাটির চেয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম।

পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ ব্যবহারের কথা কোন হাদীছেই পাওয়া যায় না। সাথে সাথে পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে ঘোরাফেরা করা একটা বেহায়াপনা মাত্র। তাই আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' (তা'লীমুদ্দীন)। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর জোরে কাসি দেওয়া ও ওঠা বসা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত' মাত্র। *-এগাছাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৯/১০৯)ঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া যাবে কিনা? আমি শিক্ষিত লোককে কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়ে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা চাইতে দেখি। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অবগত করালে কৃতজ্ঞ হবো।

-এমরান আলী

কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া বা সূরা ফাতেহা পড়া কিংবা সূরা বাক্বারাহ্র শেষাংশ পড়ার প্রমাণে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই। অনেকেই কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া যায় বলে বাতিল ও মিথ্যা হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন যা পরিহার করা আবশ্যক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদকা প্রদান করা, হজ্জ পালন করা ও কর্য আদায় করা যায়। কিন্তু কুরআন পড়া ও তার নেকী কবরে বখশানো শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শ্বে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫৮৩ পৃঃ।

প্রশ্ন (১০/১১০)ঃ আমাদের এখানে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংলগ্ন একখণ্ড জমির মালিক আমরা প্রায় ১৫ জন। মসজিদ কমিটি আমার অংশটি (তিন শতাংশ) মসজিদের জন্য চাইলে আমি তা মসজিদে ওয়াক্ফ করে দেব বলে কথা দেই। আমার ছোট ভাই তার অংশে বাড়ি করার ইচ্ছায় আমার অংশটা কিনে নিতে চায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে মসজিদ কমিটি ৮/১০ জনের অংশ কিনে নিয়েছে। আমার ছোট ভাই এর প্রস্তাব যে, যে মূল্যে কিনেছে এর সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে মসজিদকে দিয়ে দিবে। এতে মসজিদ কমিটিও রাযী। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির কোন অংশই এ পর্যন্ত মসজিদে ব্যবহৃত হয়নি। এটি বর্তমানে পতিত এবং এতে ছেলেরা খেলা করে। এর সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-নূর মুহাম্মাদ

বল্লা বাজার, টাংগাইল

উত্তরঃ মসজিদের নামে যে পরিমাণ জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয় অথবা পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা শারঈ বিধানে আল্লাহ্র পথে ওয়াক্ফকৃত বস্তুকে বিক্রি, হেবা কিংবা ওয়ারিছ হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -বুখারী, হা/২৭৬৪ পৃঃ ৩৮৭। অন্য হাদীছে রয়েছে 'দানকৃত বস্তুর মূল সম্পদ ধরে রাখ এবং তার ফল দান কর'। -ফাৎহুল বারী ৫ম খণ্ড 'দুর্বল, ফকীর এবং ধনীদের জন্য ওয়াক্ফ' অধ্যায় পৃঃ ৪০১।

প্রশ্নে উদ্ধৃত ব্যক্তি স্বীয় জমি সমজিদে ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে মসজিদ কমিটিকে কথা দিয়েছেন। কথা দেওয়ার অর্থই হ'ল ওয়াক্ফ করে দেওয়া। এক্ষণে যদি তিনি কথা পরিবর্তন করেন এবং মসজিদ কমিটিও এতে রাযী থাকেন, তবে তিনি সেটা ফেরৎ নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে হেবাকৃত বস্তু ফেরৎ নেওয়া বমি করে পুনরায় তা চেটে খাওয়ার শামিল' বলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। *-নায়লুল আওত্বার ৭/১৪৬-৫০ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com